নির্বাহী সারসংক্ষেপ

ক) ভূমিকা

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে অনেক প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়েছে। মূলত টিকাদান, পুষ্টি, মা-শিশু স্বাস্থ্য, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। একই সাথে নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ইত্যাদি সহায়ক কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বিভিন্ন সূচকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে দেশের সংবিধান এবং বিভিন্ন জাতীয় নীতিমালা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার অনুসারে (বিশেষত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি) সকল নাগরিকের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে অগ্রগতির ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিগত বছরগুলিতে স্বাস্থ্য খাতে এ দেশের অগ্রগতি শ্লথ হয়েছে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোপুরি থেমে গেছে কিংবা পশ্চাদমুখী হয়েছে। ফলে প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে । বাংলাদেশ এখনো একটি ন্যায্য (equitable),মানবিক ও টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থা গঠনের পথে দৃশ্যমান বাধাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যানসারসহ অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি, মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি, জরুরী চিকিৎসা ও মানসম্মত সেবার অপ্রতুলতা, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং স্বাস্থ্যসেবা গ্রহনে ব্যক্তি-পর্যায়ে খরচ জনগণের ওপর তীব্র চাপ তৈরি করছে। পাশাপাশি দুর্নীতি, সক্ষমতার ঘাটতি, ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এবং চিকিৎসা শিক্ষায় নিম্নমান ভবিষ্যতের জন্য একটি গুরুতর হুমকি হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ স্বাস্থ্যখাতে আজ এক জটিল বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে।

জুলাই ২৪-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যখাতকে জনমুখী, সহজলভ্য ও সর্বজনীন করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছে: ১) একটি ন্যায্য ও অধিকার-নির্ভর সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা; ২) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো ও জনবল শক্তিশালী করা; ৩) জরুরী চিকিৎসা সেবার উন্নয়ন, ৪) স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সুশাসন, আর্থিক স্বচ্ছতা ও দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহনশীলতা নীতি প্রবর্তন; ৫) মানসম্পন্ন চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি; ৬) জনসাধারণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনতে রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সন্তুষ্টি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; এবং ৭) স্বাস্থ্যসেবা গ্রহনে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে নিয়ে আসা।

এই প্রতিবেদন তৈরির কাজটি একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয় ছিল, যেখানে দীর্ঘ দিনের দুর্নীতি, অনিয়ম, পক্ষপাত, রাজনীতি প্রভাবিত কর্মকাণ্ড, অযোগ্য লোকদের নিয়োগ এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরিসংখ্যান ও বিকৃত তথ্য পুরো স্বাস্থ্যখাতের ক্ষতি করেছে। এসব চ্যালেঞ্জিং দিক তথ্য সংগ্রহে বড় বাধা সৃষ্টি করেছে। প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কমিশন তথ্য সংগ্রহের ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে।

খ) পদ্ধতি

এই প্রতিবেদন প্রণয়নে একটি বহুমাত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক বিশ্লেষণ, অংশীজনের মতামত এবং নীতিনির্ধারণে প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

একটি বহুমাত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী প্রাসঙ্গিক বিবিধ তথ্য-উপাত্ত, অংশীজনের মতামত, জরিপ থেকে প্রাপ্ত জনমত এবং সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও মতামত বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুপারিশ প্রণয়নে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছে। প্রথমত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা, গবেষণা, কৌশলপত্র এবং গাইডলাইনগুলির পর্যালোচনা করা হয়, যাতে থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্যসহ সফল দেশগুলোর অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে প্রমাণভিত্তিক সুপারিশ তৈরি করা যায়। এছাড়া, কমিশনের কার্যালয়ে নীতি প্রণয়ন, গবেষণা, সাংবাদিকতা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করা হয়, যাতে তারা তাদের মতামত এবং পরামর্শ প্রদান করতে পারে। মাঠপর্যায়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রাসঙ্গিক মতামত সংগ্রহ করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি উৎস থেকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং এভাবে অসংক্রামক রোগ, মাতৃমৃত্যু, স্বাস্থ্য ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে গভীর ধারণা লাভ করা হয়। এছাড়া, বিশেষ করে দুর্গম এবং অবহেলিত অঞ্চলের স্বাস্থ্যকর্মী ও সেবাগ্রহীতাদের মতামত সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শনও পরিচালিত হয়।

এছাড়া, জনমত জরিপের মাধ্যমে দেশের আটটি বিভাগে ৩৪৪টি নমুনা এলাকায় প্রায় ৮,২৫৬ জন নাগরিকের মতামত সংগ্রহ করা হয়। জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, ৯৭% মানুষ মনে করেন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে হওয়া উচিত, এবং ৯৫%-৯৭% উত্তরদাতা ঔষধ, পরীক্ষা ও চিকিৎসার ফি নির্ধারণের পক্ষে। ৭২% উত্তরদাতা চিকিৎসা, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য আলাদা কাঠামো চান এবং ৬৮% মনে করেন এমবিবিএস ছাড়া অন্য কেউ অ্যান্টিবায়োটিক না লিখুক। ৯২% মানুষের মত, সরকারকে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বহনে ভূমিকা পালন করা উচিত এবং ৭৯% স্বাস্থ্যহানিকর পণ্যে কর আরোপের পক্ষে। আরও, ৭১% নাগরিক স্বাস্থ্যবীমায় আগ্রহী এবং ৬৭% সেবা একীভূত করার পক্ষে। এই জরিপের ফলাফলগুলো কমিশনের সুপারিশ তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

গ) পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং চ্যালেঞ্জসমূহ :

১) স্বাস্থ্য সেবাদান ও অবকাঠামো

বাংলাদেশের সরকারি স্বাস্থ্য খাতে মোট অনুমোদিত ২,৩৬,৮২৮টি পদের মধ্যে কর্মরত আছেন ১,৭৩,২৬১ জন, ফলে ৬৩,৫৭১টি পদ (প্রায় ২৭%) শূন্য রয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় এই শূন্যতার হার কিছু শ্রেণির ক্ষেত্রে ৪০% পর্যন্ত। শহরাঞ্চলেও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামো দুর্বল। ২০২২ সালে প্রতি ১০ হাজারে সেবাদানকারী ছিলেন মাত্র ১১.৭ জন, যেখানে ২০২৫ ও ২০৩০ সালের লক্ষ্য যথাক্রমে ৩১.৫ ও ৪৪.৫ জন। চিকিৎসক ঘাটতিও প্রকট—সাধারণ চিকিৎসকে ২৫% এবং বিশেষজ্ঞে ৫৮% ঘাটতি। শহরে ১,৫০০ জনে একজন চিকিৎসক থাকলেও গ্রামে তা ১৫,০০০ জনে একজন। এসবের পেছনে রয়েছে নিয়োগের জটিলতা, স্বচ্ছতার অভাব ও পদোন্নতিতে স্থবিরতা, যার ফলে সেবার মান কমছে এবং গ্রামীণ জনগণ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য সেবা অবকাঠামো: বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সুদৃঢ় স্বাস্থ্য অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। দেশের প্রতিটি বিভাগের একটি করে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালকের দপ্তর রয়েছে। এর পাশাপাশি, ৬৪টি জেলা সদর হাসপাতাল, ৪৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ১,৩৬২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র, এবং ৩,২৯১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর পরিচালিত ২৮৮টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মধ্যে ১৬২টি ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত। এসব কেন্দ্রগুলো বর্তমানে ১০ শয্যা বিশিষ্ট হলেও ক্রমাগত ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হচ্ছে। তবে, এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে রোগীকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বা জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মোট কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৫৫,০০০, এর মধ্যে ৬০৩ পদ সাধারণ ক্যাডারে, যার মধ্যে ৩৩০ জন কর্মরত আছেন, এবং ১,১২০টি পদ টেকনিক্যাল ক্যাডারে রয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবায় প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ: স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলো প্রায়ই প্রশাসনিক কর্মকর্তারা নেন, যারা সরাসরি চিকিৎসা পেশায় অভিজ্ঞ নন। এর ফলে, সিদ্ধান্তগুলো যথাযথ অগ্রগণ্যতা এবং সময়োপযোগী বিচার থেকে বিচ্যুত হতে পারে। তাছাড়া, বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানে লাভের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া হয় এবং তাদের তদারকি করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যথেষ্ট সক্ষমতা নেই। সরকারি হাসপাতালগুলোর সেবার মান নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে, যেখানে উন্নত সেবা প্রদানে এক্রেডিটেশন (স্বীকৃতি পদ্ধতি) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটি দেশে কম পরিচিত। এক্রেডিটেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে সেবা মান উন্নয়ন করা পৃথিবীজুড়ে ব্যবহৃত প্রমাণিত পদ্ধতি হলেও আমাদের দেশে তা অপর্যাপ্ত।

স্বাস্থ্যসেবায় সমস্যাসমূহ: বাংলাদেশে বর্তমানে স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা, সহজলভ্যতা, সমানুপাতিকতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা হয়নি। মানুষজনের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান কম, যার ফলে অনেক সময় সেবা গ্রহণে সমস্যা সৃষ্টি হয়। অতীতে, সেবা ব্যবস্থাপনায় যে দুর্বলতাগুলো দেখা গেছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে অবকাঠামোগত দ্বৈততা, ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা, উপকরণের অভাব, ঔষধের উচ্চমূল্য, ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেবা প্রদানকারীদের পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগের অভাব। এছাড়া, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা না থাকায় সেবার মানের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। স্বাস্থ্য প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা, কর্মচারীদের মধ্যে পদ শূন্যতা, এবং রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষাগারের দুর্বলতা এমন কিছু বিষয়, যা সেবা ব্যবস্থাকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বড় সমস্যা: বাংলাদেশের প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা এখন মূলত অসংক্রামক রোগভিত্তিক। দেশে প্রতিবছর প্রায় ৬৭% মৃত্যু ঘটে অসংক্রামক রোগের কারণে, যেমন স্ট্রোক, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, মানসিক সমস্যা, স্থূলতা এবং শ্বাসতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদি রোগ। আরও কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে, যেমন সড়ক দুর্ঘটনা, শারীরিক অক্ষমতা, এবং অস্ত্রোপচার পরবর্তী পুনর্বাসনের অসুবিধা। যদিও কিছু সংক্রামক রোগ এখনও প্রভাব ফেলছে, তবে সেগুলোর মাত্রা কমে এসেছে। ক্যান্সার রোগের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রায় প্রতিটি পরিবারে ক্যান্সার রোগী রয়েছে। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেরি হওয়া এবং স্ক্রীনিং বা পর্যবেক্ষণের অভাব পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলছে। তবে, ক্যান্সারের প্রকৃত চিত্র জানার জন্য দেশের মধ্যে কোন নির্ভুল রেজিস্ট্রি নেই, যা সঠিক পরিকল্পনা ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করছে।

বিভিন্ন দেশে চিকিৎসার জন্য রোগীদের যাওয়া: বাংলাদেশি রোগীরা প্রতি বছর চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাতায়াত করে। আনুমানিক ৮ লাখ রোগী বছরে বিদেশে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে যান, বিশেষত ভারত, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে। এর মধ্যে অনেকেই ক্যান্সার, হৃদরোগ, অঙ্গ প্রতিস্থাপন, এবং জটিল কিডনি রোগের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যান। এর ফলে, বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাপকভাবে অপচয় হচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করছে। ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭-২০২২ সাল পর্যন্ত ভারত চিকিৎসার জন্য যাওয়ার বাংলাদেশি নাগরিকের সংখ্যা ৪৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, অনেক রোগী যথাযথ চিকিৎসা ভিসা না নিয়ে ভ্রমণ ভিসায় অথবা অবৈধভাবে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যান।

স্বাস্থ্য বিভাগ বিভাজন ও সমস্যা: ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দুটি পৃথক বিভাগে বিভক্ত করা হয়: স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। যদিও এই বিভাজন ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনার উন্নতি করার কথা ছিল, তবুও এর ফলে বেশ কিছু নতুন সমস্যা তৈরি হয়েছে। শহর এবং গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য সমস্যা কিছুটা ভিন্ন। শহরের অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, কর্মপরিবেশ, অপর্যাপ্ত সবুজ স্থান, শব্দ দূষণ, এবং হাঁটা বা সাইকেল চালানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গার অভাবের কারণে শহরের হৃদরোগ, হাঁপানি, ক্যান্সার, এবং ডায়াবেটিস রোগ আরও জটিল হয়ে উঠছে।

জাতীয় আরবান হেলথ স্ট্রাটেজি ২০২০-এ শহরভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবায় বিভিন্ন অংশীজন ও অবকাঠামোর দায়িত্ব ও ভূমিকা নির্ধারণ, সেবা ব্যবস্থাপনার কাঠামো এবং অর্থায়নের প্রস্তাবিত কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এই নীতিমালাটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য আরও স্পষ্টীকরণ ও আইনগত ভিত্তি প্রদান জরুরি।

সম্প্রতি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের অধীনে বিবিএস পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, গত এক বছরে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে ৭৮.২% এমবিবিএস চিকিৎসকের কাছ থেকে, ৫.৭% ফার্মাসির বিক্রেতার কাছ থেকে, এবং অন্যান্যরা বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৯৭% মনে করেন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে দেওয়া উচিত এবং ৯২% চান শহরের ওয়ার্ডগুলোতে ইউনিয়ন পর্যায়ের মতো প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন হোক। এছাড়া ৭২% উত্তরদাতা পৃথক অবকাঠামোর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যসেবা পরিচালনার পক্ষে মত দিয়েছেন, এবং ৬৬% চান হাসপাতাল ও মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বায়ত্তশাসন। একজন ডাক্তার যেন অন্তত ১০ থেকে ২০ মিনিট সময় দেন—এমনটাই প্রত্যাশা ৭২% উত্তরদাতার, যাঁদের মধ্যে ২৮.৫% ২০ মিনিট সময়ের পক্ষে। বিশেষজ্ঞ সেবা শুধুমাত্র জরুরি রেফারেলের ভিত্তিতে দেওয়া উচিত বলে মনে করেন ৭২% এবং সপ্তাহের সাতদিন ২৪ ঘণ্টা সরকারি অ্যাম্বুলেন্স সেবার ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে ৯৯% মত দিয়েছেন। একই ধরনের সেবা পরিচালনাকারী স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কার্যক্রম একীভূত করার পক্ষে ৬৭% উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন।

২) নেতৃত্ব, সুশাসন ও কর্মসংস্কৃতি

স্বাস্থ্য - একটি মৌলিক রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি : স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা কোনো রাষ্ট্রের মৌলিক রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি হিসেবে বিবেচিত হয়। কার্যকর স্বাস্থ্য শাসন কাঠামো গড়ে তোলা এবং একটি স্বাস্থ্য-বান্ধব শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারের প্রতি দায়িত্ব থাকে। এ লক্ষ্যে সরকারকে নিয়মিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং কখনো কখনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এসব সিদ্ধান্তের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার, সেবার মান এবং রোগীর আর্থিক বোঝা কমানো সম্ভব হয়। তবে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রায়ই কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে জটিল হয়ে পড়ে, যা প্রভাব ফেলে নাগরিকদের সেবার অভিজ্ঞতায়।

চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবতার ফারাক : বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে, যা মোকাবিলা করতে হলে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিকে বাস্তব পদক্ষেপে রূপান্তর করতে হবে। কেবল পরিকল্পনাগত চেষ্টাই যথেষ্ট নয়; এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঘাটতি, অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল, দুর্নীতি, প্রশাসনিক অদক্ষতা এবং রাজনৈতিক বা আর্থিক সিদ্ধান্তহীনতা—এসব কারণে অনেক ভালো স্বাস্থ্যনীতি সফল হয়নি। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে একটি সংহত ও সুশাসিত কাঠামো অপরিহার্য।

শাসন কাঠামোর গুরুত্ব : স্বাস্থ্য খাতে শাসন কাঠামো শক্তিশালী করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমেই একটি সমাজ তার স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যুক্ত সমস্ত দ্বন্দ্ব মোকাবিলা করে, সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত নেয় এবং প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। এজন্য বিভিন্ন অংশীজন—যেমন সামাজিক বীমা তহবিল, পেশাজীবী সংগঠন, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সরকার, এনজিও, এবং বেসরকারি খাত—একত্রিত হয়ে একটি অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে। তবে শাসন কাঠামো দুর্বল হলে তার ফলস্বরূপ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয় যেমন দুর্নীতি, পরিকল্পনার অকার্যকর বাস্তবায়ন, স্বজনপ্রীতি, অদক্ষতা এবং জনবিশ্বাসের অভাব।

দুর্বল শাসনের পরিণতি : দুর্বল শাসন কাঠামো থেকে একাধিক সমস্যা সৃষ্টি হয়, যার মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি, ভুলভাবে পরিকল্পিত নীতি, অদক্ষতা, স্বজনপ্রীতি, জনবিশ্বাসের অভাব এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব। এর ফলে, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কমে যায়, এবং জনগণের কাছে স্বাস্থ্যসেবার মান প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। এই দুর্বলতা দূর করার জন্য শাসন কাঠামোকে আরো কার্যকর, স্বচ্ছ এবং দায়িত্বশীল হতে হবে।

ভাল শাসনের মৌলিক নীতিমালাসমূহ : একটি কার্যকর এবং সমন্বিত স্বাস্থ্য শাসন ব্যবস্থার জন্য কয়েকটি মৌলিক নীতি অপরিহার্য। এসব নীতির মধ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, সততা এবং সক্ষমতা প্রধান। **স্বচ্ছতা (Transparency)** নিশ্চিত করে যে নীতি, সিদ্ধান্ত এবং সম্পদের ব্যবহার জনগণের কাছে উন্মুক্ত ও সহজবোধ্য হয়, যার মাধ্যমে জনবিশ্বাস বাড়ে এবং দুর্নীতি কমানো সম্ভব হয়। **জবাবদিহিতা (Accountability)** স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, নীতিনির্ধারক ও প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে, যাতে সেবার মান বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়। **অংশগ্রহণ (Participation)** জনগণ, সুশীল সমাজ এবং অন্যান্য অংশীজনদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে সেবাকে আরো কার্যকর ও প্রাসঙ্গিক করে তোলে। **সততা (Integrity)** স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নৈতিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং জনগণের আস্থা সৃষ্টি করে। সর্বশেষে, **ক্ষমতা (Capacity)** ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক পর্যায়ে নীতি বাস্তবায়ন, সেবা ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতা নির্দেশ করে। এই পাঁচটি নীতির সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী, দক্ষ এবং জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সাড়া দেওয়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

স্বাস্থ্য খাতে সংস্কার ও টেকসই শাসন কাঠামো : স্বাস্থ্য খাতে টেকসই, ন্যায্য এবং কার্যকর শাসন কাঠামো গড়ে তুলতে হলে জরুরি ভিত্তিতে একটি সুসংগঠিত সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়া অবশ্যই শাসনের মৌলিক নীতিগুলোর—স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, সততা এবং সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করতে হবে। এভাবে একটি "জনমুখী" স্বাস্থ্যসেবা কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে, যেখানে সেবা হবে সহজলভ্য, মানসম্পন্ন, সমতাভিত্তিক এবং জনগণের আস্থার প্রতীক। এর মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্যসেবায় বিশ্বাস বাড়বে এবং স্বাস্থ্য খাতে বিদ্যমান দুর্বলতা ও অসাম্য দূর হয়ে একটি টেকসই ও মানবিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত - শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার বাস্তব চিত্র: বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও সংবিধানের ১৫ ও ১৮ অনুচ্ছেদে স্বাস্থ্যসেবাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, বাস্তবে এই অধিকার কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। স্বাস্থ্য খাত দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক সংকট, অতিনিয়ন্ত্রণ, এবং দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামোর শিকার, যার ফলে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা কার্যকরভাবে কাজ করতে পারেনি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (MOHFW) কর্তৃক পরিচালিত হলেও, এটি বারবার রাজনৈতিক প্রভাব, কর্তৃত্বের খণ্ডতা, এবং স্বাধীন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি এই কাঠামোগত দুর্বলতাগুলোকে আরও প্রকট করে তোলে, এবং এটি স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ চেইন, ক্রয় প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুতর দুর্বলতা প্রকাশ করে। অতিরিক্ত ব্যয়, ভুয়া নথিপত্র এবং অসৎ কার্যকলাপের কারণে জনমনে ব্যাপক অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কিছু উচ্চপ্রোফাইল মামলায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলেও তা মূলত প্রতীকী ছিল এবং ব্যবস্থাগত পরিবর্তন আনতে পারে না।

শাসন ব্যবস্থার ঘাটতির পথসমূহ: বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে শাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতা ব্যাপক এবং এটি ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক—দুই স্তরেই বিদ্যমান। ব্যক্তিগত স্তরে, সরকারি খাতের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতি, অবহেলা এবং পেশাদারিত্বের অভাব মারাত্মক অদক্ষতার সৃষ্টি করেছে। এর ফলে জনস্বাস্থ্য সেবার মান হ্রাস পেয়েছে এবং জনগণের আস্থা নষ্ট হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে, ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার মধ্যে রয়েছে বাজেট পরিকল্পনা, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, ক্রয় প্রক্রিয়া এবং লজিস্টিক ব্যবস্থাপনার অসঙ্গতি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে সরঞ্জাম ক্রয়ে বিলম্ব, সম্পদের অপব্যবহার এবং গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে ব্যর্থতা দেখা গেছে। এর ফলে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সময়মত ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

শাসন ব্যবস্থার ঘাটতির কারণসমূহ: বাংলাদেশের স্বাস্থ্য শাসনে প্রাতিষ্ঠানিক এবং নেতৃত্বের দুর্বলতা সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। নেতৃত্বের দুর্বলতা নীতি বাস্তবায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। গ্লোবাল হেলথ সিকিউরিটি ইনডেক্স ২০২৩ অনুযায়ী, স্বাস্থ্য শাসনের দিক থেকে বাংলাদেশ ১৯৫টি দেশের মধ্যে ১১৩তম অবস্থানে রয়েছে, যা ভারত (৬৬তম) এবং শ্রীলঙ্কা (৭২তম) এর তুলনায় অনেক পিছিয়ে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও একটি বড় সমস্যা; ২০২২ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (BIDS)-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৬০% স্বাস্থ্য নেতৃত্বের পদ রাজনৈতিক প্রভাবে পূর্ণ হয়েছে, যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধীরতা এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (DGHS) বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া যেমন—ডেঙ্গু মহামারী কিংবা কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সংগ্রহে—এসবও শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা প্রতিফলিত করে।

স্বাস্থ্য অর্থায়নের অব্যবস্থাপনা চিত্র: বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা এবং ক্রয় দুর্নীতি একটি বড় সমস্যা। বিশ্বব্যাংকের ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য খাতে অনিয়মের কারণে প্রতি বছর প্রায় ৩০% বাজেট অপচয় হয়। এছাড়া, কোভিড-১৯ চলাকালীন কিছু হাসপাতালে প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামের দাম ৩০০% পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল, যা মূল্যস্ফীতির একটি উদাহরণ। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB)-এর ২০২৪ সালের গবেষণায় দেখা যায়, নতুন কেনা ৪০% চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়নি, যা কেবল পরিকল্পনার অভাবকেই নয়, বরং অপচয় এবং ব্যবস্থাপনা সমস্যা প্রকাশ করে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটের বড় অংশ বিদেশি মুদ্রায় যন্ত্রপাতি এবং ওষুধ ক্রয়ে ব্যয় হয়, তবে স্থানীয় এজেন্ট ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা দরপত্র প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে থাকে, যার ফলে উচ্চমূল্যের যন্ত্রপাতি কেনা হয়। যেমন, খুলনার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দশ বছর ধরে অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পড়ে ছিল এবং বরিশালের একটি হাসপাতালে এক কোবাল্ট মেশিন প্রায় নয় বছর ধরে মেরামত ছাড়াই পড়ে ছিল।

ক্রয় অনিয়মের একটি দৃষ্টান্ত: এক বড় দাতাসমর্থিত প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালকের অদক্ষতা এবং সরকারি আর্থিক নিয়ম না জানার কারণে অনিয়ম ঘটেছিল, যার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়। এই অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেয় যে, দক্ষ ব্যবস্থাপক এবং নেতৃত্বের অভাবে স্বাস্থ্যখাতে বড় ধরনের ব্যর্থতা ঘটে।২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনে দেরি হওয়ার কারণে পরিবার পরিকল্পনার উপকরণ, বিশেষত কনডমের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়। এর ফলে, গ্রাহকরা বাজার থেকে এসব উপকরণ কিনতে বাধ্য হন, যা দীর্ঘদিনের সফল কর্মসূচিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।বিশ্বব্যাংকের ২০২৪ সালের পাবলিক এক্সপেনডিচার রিভিউ অনুযায়ী, নবনির্মিত হাসপাতালগুলোর প্রায় ৪৫% জনবল ও মৌলিক ইউটিলিটির অভাবে চালু হতে বিলম্ব করেছে। অনেক সময় স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন রাজনৈতিক বিবেচনায় পরিচালিত হয়, ফলে জনগণের স্বাস্থ্য চাহিদার পরিবর্তে এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। অনেক জায়গায় জাতীয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণের অভাব রয়েছে, যার ফলে সঠিকভাবে সেবা প্রদান সম্ভব হয়নি।

রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্নীতি: রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে বহু ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় স্থানে হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে চিকিৎসক, যন্ত্রপাতি বা কর্মী নেই। অনেক স্থাপনা কাগজে সম্পূর্ণ হলেও, তারা ব্যবহারযোগ্য নয়, ফলে জনগণ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয় এবং ঠিকাদারদের লাভ হয়।গত ২৫ বছরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট বেড়েছে, এবং রাজনৈতিক মহল নির্মাণ প্রকল্পে লবিং শুরু করেছে, যার ফলে নির্মাণের স্থান এবং প্রকৃতি নির্ধারণে রাজনৈতিক সুবিধা বণ্টন করা হয়, এবং নিম্নমানের স্থাপনা নির্মিত হয়।

৪) স্বাস্থ্য জনবলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ :

যে কোন স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য স্বাস্থ্য জনবল একটি অপরিহার্য উপাদান। যথাযথ স্বাস্থ্য জনবল পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ক্যাটেগিরির যথেষ্ট সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা যে কোনো স্বাস্থ্যব্যবস্থার সফলতার জন্য অপরিহার্য। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিদর্শিত হলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের মধ্যেও জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য জনশক্তির সংখ্যা সবচেয়ে কমা পরিমাণের সঙ্গে জনবলের মানের কথা চিন্তা করলে এই সমস্যাটি আরো প্রকট হয়ে ওঠে। স্বভাবতই দেশের স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর আলোচনা করতে হলে স্বাস্থ্য জনবলের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ইস্যুগুলি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। প্রথম চ্যালেঞ্জই হচ্ছে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক-প্রশিক্ষক ও গবেষকের ঘাটতি। অন্য চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে দক্ষ এবং ন্যায্যভাবে শিক্ষক-প্রশিক্ষক নিয়োগ, এই জনশক্তিকে সঠিক স্থানে রাখা রাখতে পারা, দক্ষতার যথাযথ মিশ্রণ, সামর্থ্য ও কর্মদক্ষতার মূল্যায়ন, জবাবদিহিতা, সমন্বয় দক্ষতা এবং নীতি নির্ধারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি পরিকল্পিত সুপরিকল্পিত তথ্য ব্যবস্থাপনা।

শিক্ষক-প্রশিক্ষক-গবেষক ইস্যু ছাড়াও ভৌত অবকাঠামো এবং অন্যান্য সহায়ক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রচুর সংখ্যক চ্যালেঞ্জ রয়েছে এক্ষেত্রে। গত বছরে দেশে একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। সেই সঙ্গে দেশের জনগণ এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিটি আশা করছি যে টেকসই লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্য ৩ (উত্তম স্বাস্থ্য ও সুস্থতা) অর্জনে সরকার আরো দ্রুত সফল হবে। তবে ২০৩০ সালের পূর্বে যে সামান্য কয়েকটি বছর রয়েছে তার মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অর্জন (যা এসডিজি ৩ অর্জনের আবশ্যিক অঙ্গ) অর্জনে, বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বাস্তবতায়, কঠিন হয়ে পড়বে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কারে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এই বাস্তবতা, বিশেষ বিশেষ চ্যালেঞ্জ, ও গৃহীত পদক্ষেপগুলিকে সমন্বিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য জনবল সৃষ্টির সামর্থ্য : বাংলাদেশে ৩৭টি সরকারি (৫৩৮০ আসন সংখ্যা), ৬৭টি বেসরকারি (৬২৯৮ আসন সংখ্যা), একটি আর্মড ফোর্সেস (১২৫ আসন সংখ্যা) এবং ৫টি আর্মি মেডিকেল কলেজ (২৫০ আসন সংখ্যা) রয়েছে। ডেন্টাল কলেজের ক্ষেত্রে ১টি সরকারি ডেন্টাল কলেজও ৪টি ডেন্টাল ইউনিট এবং ২৬টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ রয়েছে যেখানে যথাক্রমে ৫৪৫ ও ১৪০৫ আসন সংখ্যা রয়েছে। বিএমডিসি-র তথ্য অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ উভয় ক্ষেত্রে ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ সেশন থেকে ছাত্রী সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যানুপাত বেশি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির তথ্য অনুযায়ী, নারী চিকিৎসকদের সংখ্যা বেশি।

বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিশেষজ্ঞের সংখ্যা অনেক কম, তাদের মধ্যে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা আরো কম। বর্তমানে, বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের (যেমন হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা, অসংক্রামক ব্যাধি, কমিউনিটি মেডিসিন, রোগতত্ত্ববিদ্যা, রিপ্রোডাক্টিভ ও চাইল্ড হেলথ, এনভায়রনমেন্টাল ও অকুপেশনাল হেলথ, হেলথ প্রমোশন ও হেলথ এডুকেশন ইত্যাদি) মোট সংখ্যা মাত্র ৩,৫৬৩ জন।

দেশে ডিগ্রিধারী ক্লিনিক্যাল বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (MD, MS, FCPS, MCPS) বিশেষজ্ঞদের চাহিদা দেশের জনসংখ্যা এবং রোগের বর্ধিত প্রাদুর্ভাবের কারণে অনেক বেশি বেড়েছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শতকরা মাত্র ২৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠান পাবলিক সেক্টরে রয়েছে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় সেগুলিতে খরচ যৎসামান্য। বিগত বছরগুলিতে প্রাইভেট সেক্টরে স্বাস্থ্যকর্মী সৃষ্টির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে অতি দ্রুত। ফলে, প্রায় সকল ধরনের ডিগ্রি ও কোর্সের জন্য প্রাইভেট সেক্টরের তুলনায় আসন সংখ্যার অনুপাত অনেক গুণ বেশি।

২০২১ সালে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সংখ্যা সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে যেখানে দেশের স্বাস্থ্য জনবলের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মী সৃষ্টির তুলনা করে করা হয়েছে। এর সঙ্গে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য জনবল সংক্রান্ত তথ্যসংক্ষেপ মিলিয়ে দেখা যায় যে, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করতে হলে চিকিৎসকের সংখ্যা ১.৮ গুণ বৃদ্ধি করতে হবে। এই অনুপাত কিছুটা রক্ষণধর্মী কারণ বিদ্যমান জনবল পরিকল্পনার ভিত্তিতে সেটি করা হয়েছে এবং সেটি কিছুটা কম হতে পারে। এই হিসাব অনুসারে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কর্মীদের সংখ্যা ১.৫ গুণ ও নার্সিং-সহযোগী সহযোগী কর্মীদের সংখ্যা ৩ গুণ বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য-সহায়ক কর্মীদের সংখ্যা (যারা মূলত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পর্যায় কর্মরত তাদের সংখ্যা) প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এদেশে। বাংলাদেশ স্বাস্থ্য জনবলের কর্মক্ষেত্রের পর্যায় খুব সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়।

এদেশের প্রয়োজন এই হারে স্বাস্থ্য জনবল সৃষ্টির মাধ্যমে মেটানো সম্ভব নয়। বর্তমান আসন সংখ্যা অনুযায়ী চিকিৎসক-এর সঙ্গে নার্স-মিডওয়াইফ- এর সৃষ্টির অনুপাত ১:১.৫, অথচ স্বাস্থ্যকর্মীর স্টক-এর ভিত্তিতে সেই অনুপাত ১:০৭, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত অনুপাতের অনেক কম। লক্ষ্যণীয় যে, স্বাস্থ্য প্রশাসক, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং বায়োস্ট্যাটিশিয়ান-এর মত স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের সংখ্যা অনেক হওয়া উচিত, অথচ খুব কম সংখ্যক প্রতিষ্ঠানে এই পেশাজীবীদের সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং বিশ্লেষণে তাদের বিবেচনা করা হচ্ছে না।

শিক্ষক-প্রশিক্ষক-গবেষক-এর এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সম্পর্কে সংখ্যা নির্ণয়ের চ্যালেঞ্জ: দেশে শিক্ষক-প্রশিক্ষক-গবেষকের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের প্রয়োজনভিত্তিক সংখ্যা নির্ণয়ের সমন্বিত কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বিভিন্ন নীতিমালা ও দাপ্তরিক আদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন শাখায়, কিছুটা অপরিকল্পিতভাবে, শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাতের একটি সাধারণ ধারণার ভিত্তিতে শিক্ষক-প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং সেটিও বহু বছর একই অনুপাতে রয়ে গেছে।

যথাযথ দক্ষতার মিশ্রণ সহ জনবল সৃষ্টি: এই সংক্রান্ত দক্ষতার যথাযথ মিশ্রণ সংক্রান্ত কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই, সাধারণভাবে স্বাস্থ্য জনবলের সৃষ্টি পরিকল্পনা করা হয়।

বর্তমানকালে স্বাস্থ্য জনশক্তি সৃষ্টিতে গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবন (innovation), সংক্ষেপে RDI, একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নততর জ্ঞান, দক্ষতা এবং উদ্ভাবক তৈরীর ক্ষেত্রে, এবং সেই সঙ্গে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস তৈরির জন্য এ কাজগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, উচ্চতর জনশক্তি সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই উপাদান অপরিহার্য। কিন্তু বাংলাদেশে এ ধরনের পদক্ষেপ অত্যন্ত অপ্রতুল। স্বাধীনতার পর পরই 'বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল' সৃষ্টি করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে; কিন্তু যথাযথ আইনগত ভিত্তি এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে প্রতিষ্ঠানটি সেভাবে অগ্রসর হতে পারেনি। এই ত্রুটির ফলে প্রতিষ্ঠানটি দেশে একটি গবেষণা সংস্কৃতি সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে।

স্বাস্থ্য জনবল স্বাস্থ্য জনবল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় সুদক্ষ পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্তির অভাব: স্বাস্থ্য জনবল সৃষ্টির ক্ষেত্রে ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় দক্ষ পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত আবশ্যক। বাংলাদেশ এ বিষয়ে এ পর্যন্ত নেতৃত্বদানকারীদের অনেকেরই এই বিশেষ বিষয়গুলিতে তেমন কোন শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ছিল না।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন শাখায় সমন্বয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা ও সমন্বয়: স্বাস্থ্য জনবল সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সঙ্গে পরিকল্পনাগত এবং বাস্তবায়ন সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের অভাব রয়েছে।

এক্রেডিটেশন: বাংলাদেশের শিক্ষা (বিশেষত উচ্চতর শিক্ষা)-র বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতির জন্য এক্রেডিটেশন একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় কিন্তু সেটির কোন সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সাম্প্রতিককালে একটি কাউন্সিল করা হয়েছে, কিন্তু এটিও শুধুমাত্র এমবিবিএস প্রোগ্রামের জন্য এবং এখন পর্যন্ত সেভাবে সক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়নি।

বিগত বছরগুলিতে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের সমস্যা : সারা বিশ্বেই সাম্প্রতিক বছরগুলিতে স্বাস্থ্য জনবলের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এক্ষেত্রে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। সে তুলনায় বাংলাদেশ শিক্ষা-প্রশিক্ষণের কারিকুলাম-সিলেবাস এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন এখনো সীমিত রয়ে গেছে।

প্রতিষ্ঠানগুলির ভৌত অবকাঠামো এবং অন্যান্য সহায়ক সম্পদের সীমাবদ্ধতা: এমনকি প্রথম দিকের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ছাত্র-ছাত্রী আসন সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি করা হলেও অবকাঠামো, সহায়ক সম্পদ এবং জনবলের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো উন্নয়ন করা হয়নি। নতুনগুলোর ক্ষেত্রেও প্রচুর সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে।

কারিকুলাম বহির্ভূত কার্যক্রম: শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুধুমাত্র কারিকুলার কার্যক্রম যে ছাত্রদের মান বৃদ্ধি করে তা নয়। কারিকুলাম বহির্ভূত যেসব সৃষ্টিশীল কার্যক্রম রয়েছে সেগুলিও কিন্ত অত্যন্ত প্রয়োজন; অথচ সেগুলোর সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমাবদ্ধ।

বেসরকারি খাতে শিক্ষা: বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক পদক্ষেপ ও নীতির কারণে, সরকারি খাতের তুলনায় বেসরকারি খাতে অনেক বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। অথচ সেগুলোর শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মান সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে এবং এটি বাংলাদেশের জন্য প্রধান একটি চ্যালেঞ্জ। যখন অনেক অর্থ ব্যয় করে কেউ শিক্ষা লাভ করে তখন সেটি ফেরত আনা পরিবারের ও অভিভাবকের জন্য একটি বিশেষ আগ্রহের কারণ হয়ে ওঠে।

৫) অত্যাবশ্যকীয় ঔষধপত্র, চিকিৎসা প্রযুক্তি ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ

অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সর্বজনীন প্রাপ্তি প্রতিটি নাগরিকদের মোলিক স্বাস্থ্য অধিকার । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুসরণ করে বাংলাদেশ সরকার একটি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা প্রণয়ন করেছে, যাতে ২৮৫ টি ওষুধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করার দায়িত্ব ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের (DGDA)। দেশীয় ওষুধ শিল্প বর্তমানে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ, যা দেশের চাহিদার ৯৮ শতাংশ পূরণ করতে সক্ষম। বাংলাদেশের ওষুধ আজ ১০০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে । এই শিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে ১.৮ শতাংশ অবদান রাখছে। তবে এই সাফল্যের পাশাপাশি বেশ কিছু কাঠামোগত দুর্বলতা এখনো রয়ে গেছে, যা জনগণের জন্য মানসম্পন্ন ও সাশ্রয়ী ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প এখনো সক্রিয় ফার্মাসিউটিক্যাল উপাদান (API)-এর ক্ষেত্রে চীন ও ভারতের ওপর ৮৫ শতাংশের বেশি নির্ভরশীল। এই অতিনির্ভরতা কোভিড-১৯ পরবর্তী বৈশ্বিক সংকটে গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্ব বাজারে এপিআই-এর মূল্য বৃদ্ধি, টাকার অবমূল্যায়ন এবং উৎপাদন ব্যয় বাড়ার ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে ওষুধের দাম বেড়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে সাধারণ ও নিম্নআয়ের মানুষের ওপর, যাদের আয়ের একটি বড় অংশ ওষুধ কিনতে ব্যয় হচ্ছে। বর্তমানে দেশের মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের প্রায় ৭৩ শতাংশ ব্যক্তি পর্যায়ের খরচ, যার সিংহভাগই ব্যয় হয় ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রীর পেছনে। সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ সময়ে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ পাওয়া যায় না, যার ফলে রোগীদের বেসরকারি ফার্মেসির ওপর নির্ভর করতে হয়। এতে অনর্থক ব্যক্তি পর্যায়ের খরচ বাড়ে এবং অনেকে মারাত্মক আর্থিক চাপে পড়েন।

সরবরাহ ব্যবস্থার বৈষম্যও একটি বড় সমস্যা। শহরাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে ফার্মেসির বিস্তার বেশি হলেও গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সহজলভ্য নয়। বর্তমানে দেশে অনুমোদিত ফার্মেসির সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ, এবং প্রতিদিন গড়ে ২২০টির বেশি নতুন ফার্মেসি অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এসব ফার্মেসির একটি বড় অংশ প্রশিক্ষিত ফার্মাসিস্ট ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে। নিয়ম না মেনে অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি, ওষুধের অপব্যবহার, এবং নিয়ন্ত্রণহীন বাজার বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। এর ফলে ওষুধের মান, কার্যকারিতা এবং রোগীদের নিরাপত্তা, সবই ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সীমিত সক্ষমতার কারণে বাজারে নকল, নিম্নমানের ওষুধ এবং মানহীন রোগ নির্ণয় সরঞ্জাম ছড়িয়ে পড়েছে। ওষুধের দাম নির্ধারণেও অস্পষ্টতা রয়েছে। বর্তমানে মাত্র ১১৭টি ওষুধের দাম ডিজিডিএ সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে; বাকি ওষুধের দাম কোম্পানিগুলোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে দাম ও গুণমান, দুই ক্ষেত্রেই বিরূপ প্রভাব পড়ছে । তদারকির অভাব, ফার্মাকোভিজিলেন্স ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং জনবল ঘাটতি ডিজিডিএ-র কার্যকারিতা সীমিত করে রেখেছে, যা বাজারে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বড় অন্তরায়।

সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান Essential Drugs Company Limited (EDCL) দেশের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সরবরাহ করে থাকে। তবে এই প্রতিষ্ঠানে সুশাসনের ঘাটতি, সরবরাহে বিলম্ব, চুক্তি প্রদান প্রক্রিয়ায় অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ বারবার উঠে এসেছে। এসব দুর্বলতার কারণে নির্ধারিত সময়মতো ওষুধ পৌঁছে না, এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় না হওয়ার ঝুঁকি থাকে। একই সাথে বেসরকারি খাতের ওষুধ উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানগুলো অতিরিক্ত মুনাফাকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ডাক্তার ও ফার্মেসির ওষুধ বিক্রেতার সাথে অনৈতিক প্রচারণা ও অবৈধ লেনদেনের নানা অভিযোগ আছে। নানা সময়ে বিদ্যমান নীতি ও কৌশলের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ওষুধের আযাচিত মুল্য বৃদ্ধি অভিযোগও পাওয়া যায়।

এই বাস্তবতায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হলে একটি সমন্বিত ও কাঠামোগত রূপান্তর অপরিহার্য। ডিজিডিএ-র নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা, জনবল এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা দ্রুত বাড়াতে হবে। ওষুধের মূল্য ও মান নিয়ন্ত্রণে আধুনিক আইন ও শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। স্থানীয়ভাবে এপিআই উৎপাদনের জন্য সরকারি প্রণোদনা ও অবকাঠামো সহায়তা প্রয়োজন, যাতে আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর নির্ভরতা কমানো যায়। একই সঙ্গে ইডিসিএল-কে পুনর্গঠনের মাধ্যমে তার কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি খাতের ওষুধ উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে হবে। প্রশিক্ষিত ফার্মাসিস্ট তৈরির জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করতে হবে এবং একটি জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে, যা শহর ও গ্রাম, উভয় অঞ্চলের হাসপাতালগুলোতে সমভাবে কার্যকর হবে।

অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ শুধু চিকিৎসা নয়, এটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা, আস্থা এবং মর্যাদার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এই খাতে যে দুর্বলতা, অনিয়ম ও বৈষম্য রয়েছে, তা দূর করতে না পারলে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই এখনই সময়—সাহসী সিদ্ধান্ত, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি কার্যকর ও ন্যায্য ওষুধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার।

৬) স্বাস্থ্য তথ্যব্যবস্থা

স্বাস্থ্য তথ্যব্যবস্থার (HIS) উন্নয়নে বাংলাদেশ গত দুই দশকে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। বর্তমানে দেশের HIS কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—রুটিন স্বাস্থ্য তথ্য, জনসংখ্যাভিত্তিক জরিপ, জনস্বাস্থ্য নজরদারি এবং নাগরিক জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ব্যবস্থা। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেমন DHIS2 এবং eMIS সার্বিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, আর জাতীয় জরিপগুলো (যেমন BDHS, MICS, BMMS, BHFS) স্বাস্থ্য অবস্থা ও সেবা কাভারেজের উপর গভীরতর তথ্য দিচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নজরদারি কেন্দ্রগুলো দীর্ঘমেয়াদি তথ্য সরবরাহ করে যা নীতিনির্ধারণে সহায়ক।

রুটিন তথ্য ব্যবস্থার পরিসর ও সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। DHIS2 বর্তমানে দেশের ১৪,০০০-এর বেশি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে চালু আছে এবং এতে সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩৭,০০০-এর অধিক। প্ল্যাটফর্মটি হাসপাতালে ভর্তি, টিকাদান, রোগ নির্ণয়, লজিস্টিকস, মৃত্যু-সংক্রান্ত তথ্যসহ স্বাস্থ্যসেবার নানা সূচক সংরক্ষণে ব্যবহৃত হচ্ছে। অপরদিকে, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের eMIS প্ল্যাটফর্ম মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রজননস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবা পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হচ্ছে। OpenMRS+, HRIS, OpenSRP, এবং eLMIS-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলোও চিকিৎসাসেবা, জনবল, সরঞ্জাম ও ওষুধ ব্যবস্থাপনার তথ্য ডিজিটালভাবে সংরক্ষণে ভূমিকা রাখছে।

রুটিনবহির্ভূত তথ্যসূত্র—যেমন জনস্বাস্থ্য জরিপ ও নজরদারি ব্যবস্থাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। BDHS, MICS, BMMS, BHFS-এর মতো জরিপগুলো স্বাস্থ্যসেবার মান, ব্যবহারের বৈষম্য, এবং স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির নানা দিক তুলে ধরে। সারাদেশে চালু হওয়া নজরদারি কেন্দ্র যেমন Matlab, Chakaria, Baliakandi এবং ঢাকার নগর এলাকায় পরিচালিত Demographic Surveillance Site-গুলো নিয়মিতভাবে মৃত্যুহার, প্রসব, শিশুস্বাস্থ্য ও স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে, যা মহামারি ও স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থার পূর্বাভাসেও গুরুত্বপূর্ণ।

তবে, এই অগ্রগতি সত্ত্বেও, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থার সক্ষমতা এখনো অনেক সীমাবদ্ধতায় জর্জরিত।

১. তথ্যের গুণগত মান একটি বড় দুর্বলতা। DHIS2 এবং eMIS-এ সংগৃহীত তথ্যে অনেক সময় অসম্পূর্ণতা, ভুল এন্ট্রি, বা পুরনো জনসংখ্যা ডিনোমিনেটর ব্যবহারের কারণে পরিসংখ্যানগুলো বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে, অনেক সময় সেবার কাভারেজ বা রোগের প্রকোপের হিসাব অতিরিক্ত বা কম করে ধরা পড়ে, যা নীতিনির্ধারণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

২. প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে আন্তঃসংযোগ সীমিত। DHIS2, eMIS, CRVS, surveillance বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলো একে অপরের সঙ্গে কার্যকরভাবে সংযুক্ত না হওয়ায় একীভূত স্বাস্থ্য তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। রোগীর স্বাস্থ্য-যাত্রার পূর্ণ চিত্র—প্রাথমিক থেকে তৃতীয় স্তরের সেবা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান—আজও বিচ্ছিন্নভাবে সংরক্ষিত, যা একটি 'continuum of care' নিশ্চিত করতে ব্যর্থ।

৩. তথ্য ব্যবহারের সংস্কৃতি এখনো গড়ে ওঠেনি। বিশাল পরিমাণে তথ্য সংগৃহীত হলেও, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ব্যবস্থাপক এবং কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারকরা অনেক সময় সেই তথ্য ব্যবহার করতে পারেন না, প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও ভিজ্যুয়াল টুলসের অভাবে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ, ব্যবহারবান্ধব ড্যাশবোর্ড এবং ফিডব্যাক ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৪. অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাকে দুর্বল করছে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, উচ্চগতির ইন্টারনেট, পর্যাপ্ত কম্পিউটার ও প্রশিক্ষিত অপারেটর না থাকায় রিয়েল-টাইম তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। এটি ডিজিটাল ব্যবস্থার সার্বজনীনতা এবং কার্যকারিতা দুটোকেই বাধাগ্রস্ত করে।

৫. eMIS-এর টেকসইতা একটি উদ্বেগজনক ইস্যু। এই সিস্টেমটি বহুলাংশে বিদেশি অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। অব্যাহত প্রযুক্তি সহায়তা, সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণ, এবং জনবল প্রশিক্ষণের অভাব eMIS-এর দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বকে হুমকির মুখে ফেলেছে। পাশাপাশি DHIS2 ও eMIS-এর মধ্যে আন্তঃসংযোগের ঘাটতিও কার্যকারিতা কমিয়ে দিয়েছে।

৬. জরিপ ও নজরদারির ক্ষেত্রে একাধিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। জরিপে অনেক সময় স্মৃতি-নির্ভর তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়, যা ফলাফলকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। দূর্গম এলাকায় পৌঁছানো, লোকবল ঘাটতি, অনভিজ্ঞতা এবং প্রশাসনিক জটিলতাও কার্যক্রমে বিলম্ব ঘটায়। দীর্ঘমেয়াদে এসব কার্যক্রমের টেকসইতা রক্ষায় স্থায়ী অর্থায়ন ও কাঠামোগত সমর্থন জরুরি।

৭. HISPIX অনুযায়ী, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থার সামগ্রিক স্কোর ৩০-এর মধ্যে মাত্র ১৫ (অর্থাৎ ১০০-এর মধ্যে ৫০)। স্বাস্থ্য জরিপ ও রিসোর্স ট্র্যাকিংয়ে কিছু অগ্রগতি থাকলেও, মৃত্যুনিবন্ধন, তথ্য বিশ্লেষণ, রিপোর্টিং মান এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই ওয়েব-ভিত্তিক রিপোর্টিং, প্রমিত ডেটা কোয়ালিটি মূল্যায়ন এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য নিয়ম (IHR) বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থার ভিত্তি নির্মিত হলেও, এটি এখনো খণ্ডিত, অপর্যাপ্ত এবং প্রকৃত অর্থে স্বাস্থ্যব্যবস্থার আধুনিক চাহিদা পূরণে অক্ষম। যদি এই ব্যবস্থাকে একটি সুসংহত, তথ্যনির্ভর ও রেসপন্সিভ কাঠামোতে রূপান্তর করা না যায়, তবে এটি সামগ্রিক স্বাস্থ্যখাতের অগ্রগতিকেই প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত করবে। এখনই প্রয়োজন—একটি সমন্বিত ডিজিটাল রূপান্তর পরিকল্পনা, তথ্যের মানোন্নয়ন, আন্তঃসংযুক্তি, এবং একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামোর ভিত্তিতে স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাকে জাতীয় অগ্রাধিকারের স্তরে উন্নীত করা।

৭) স্বাস্থ্য অর্থায়ন

বাংলাদেশ বিগত দুই দশকে বাংলাদেশ প্রভুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে। মাথাপিছু আয়, জীবনমান এবং মানব উন্নয়ন সূচকে দৃশ্যমান উন্নতি হয়েছে, অথচ স্বাস্থ্যখাত অর্থায়নের কাঠামো ও কার্যকারিতায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটেনি। ২০২১ সালে দেশের মাথাপিছু আয় ২,৪৮৩ মার্কিন ডলারে উন্নীত হলেও স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বিনিয়োগ এবং আর্থিক সুরক্ষার অন্যান্য সূচকগুলোতে এই উন্নয়নের ছোয়া লাগেনি। ২০০০ সালে জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬ শতাংশ, যা ২০২১ সালে নেমে এসেছে মাত্র ৪.২ শতাংশে। একই সময়ে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয় জিডিপির ০.৭–০.৮ শতাংশের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত ন্যূনতম মানেরও অনেক নিচে এবং পৃথিবীর মাঝে অন্যতম সর্বনিম্ন। ২০২১ সালে বাংলাশে মাথাপিছু সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয় ছিল মাত্র ২৬ মার্কিন ডলার, যা ভারতে ৮১ ডলার, নেপালে ৭৬ ডলার এবং শ্রীলঙ্কায় ২৮৩ ডলার। এ প্রবণতা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ চরমভাবে অপর্যাপ্ত, যা জনগণের স্বাস্থ্য অধিকার বাস্তবায়ন এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বড় বাধা তৈরি করছে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন কাঠামো এখনো প্রকল্পনির্ভর এবং দাতা-নির্ভর, যেখানে টেকসই ও সমন্বিত তহবিল ব্যবস্থাপনার অভাব সুস্পষ্ট। দেশের কর-জিডিপি অনুপাত মাত্র ৯ শতাংশ, যেখানে অধিকাংশ উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এটি ১৫–২০ শতাংশের মধ্যে থাকা উচিত। স্বাস্থ্যবান্ধব করনীতির আওতায় তামাক সারচার্জ চালু হলেও, এই রাজস্বের বরাদ্দ স্বাস্থ্যখাতের জন্য নিশ্চিত করা যায়নি। জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত আর্থিক পরিকল্পনা এবং ফান্ডিং মেকানিজমের অনুপস্থিতির কারণে স্বাস্থ্যখাতের অর্থায়ন এখনও টেকসই ভিত্তি লাভ করেনি।

একদিকে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ অপ্রতুল, অপরদিকে, বরাদ্দকৃত এই অর্থেরও দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ২০১০ সালে যেখানে বরাদ্দের ৯২ শতাংশ ব্যয় হয়েছিল, ২০২১ সালে এই হার কমে এসেছে ৬৯ শতাংশে। বাজেট বাস্তবায়নে বিলম্ব, প্রশাসনিক অদক্ষতা এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা সেবা সম্প্রসারণ ও গুণগত উন্নয়নকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। এর ফলে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেও কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ বা গুণগত পরিবর্তন ঘটছে না, যা স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন ব্যবস্থাপনায় গভীর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

সরকারি স্বাস্থ্য বাজেটের বরাদ্দ এখনো ইনপুটভিত্তিক (যেমন শয্যা সংখ্যা, ভবন) সূচকের ওপর নির্ভরশীল, বাস্তব জনস্বাস্থ্য চাহিদা কিংবা আউটপুটভিত্তিক ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ নয়। অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ (ESP) ২০১৬ সালে হালনাগাদ হলেও, ক্রমবর্ধমান অসংক্রামক রোগের চাহিদা এবং জনসংখ্যার বার্ধক্যের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট এতে প্রতিফলিত হয়নি। এর ফলে স্বাস্থ্যখাতে বাজেটের বরাদ্দ তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক ও জনস্বাস্থ্যের চাহিদা ভিত্তিক হয়নি। কোভিড-19 মহামারির অভিজ্ঞতা দেশের জরুরি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা নগ্ন করে দিয়েছে, যেখানে জরুরি তহবিল সংগ্রহ ও বরাদ্দের সক্ষমতা ছিল মারাত্মকভাবে সীমিত।

সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK) ও নগরভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতা ও পরিধি এখনো নগন্য। অপর দিকে বেসরকারি খাতে ফি-ফর-সার্ভিস মডেল (টাকার বিনিময়ে সেবা) অতিরিক্ত এবং অনিয়ন্ত্রিত সেবাকে উৎসাহিত করছে। এতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, যা দেশের জনগণকে আর্থিক ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছে। ২০২১ সালে মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৭২ শতাংশ ব্যক্তিগত ব্যয় থেকে এসেছে। এই হার দক্ষিণ এশিয়া এবং সারা বিশ্বে অন্যতম সর্বোচ্চ। ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয়ের ৬২ শতাংশ খরচ হয় ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়ে, যা সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং ভর্তুকির সীমাবদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ। ব্যক্তি পর্যায়ের এই অতিরিক্ত ব্যয় জনগণকে দরিদ্র হবার ঝুঁকিতেও ফেলে দিতে পারে । ২০১৬ সালের তথ্যমতে, ১৫% শতাংশ পরিবার এ ধরণের বিপর্যয়কর চিকিৎসা ব্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে অতিরিক্ত ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় শুধু আর্থিক সুরক্ষাকে দুর্বল করে না, এটি দীর্ঘ মেয়াদে সেবার প্রাপ্তিতা ও ধারাবাহিকতাকেও বাধাগ্রস্ত করে ।

এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য এখন মৌলিক রূপান্তর প্রয়োজন। প্রথমত, স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়াতে হবে । দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে হবে। তৃতীয়ত, ইনপুটভিত্তিক বাজেট প্রক্রিয়া থেকে সরে এসে চাহিদাভিত্তিক ও ফলাফলনির্ভর বাজেটিং এবং কৌশলগত ক্রয়ব্যবস্থা (Strategic Purchasing) চালু করতে হবে, যাতে কার্যকর ও ব্যয়-সাশ্রয়ী সেবা ও চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার দেয়া যায়। একই সঙ্গে, জরুরি স্বাস্থ্য সংকটে দ্রুত সাড়া দিতে একটি স্থায়ী ইমার্জেন্সি হেলথ ফান্ড গঠন এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতির সক্ষমতা তৈরি করা জরুরি।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে। এখনই সময়—একটি সুদূরপ্রসারী, প্রমাণভিত্তিক ও দায়িত্বশীল নীতিমালার মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাতের অর্থায়ন কাঠামো পুনর্গঠন করা। এটি কেবল জনগণের স্বাস্থ্যগত মঙ্গল নিশ্চিত করবে না, বরং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই ও স্বাস্থ্যনিরাপদ উন্নয়নের ভিত্তি শক্তিশালী করবে। স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে, সমতা ও কার্যকারিতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে, এবং ভবিষ্যতের ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য সক্ষমতা তৈরি করে, বাংলাদেশ আগামী প্রজন্মের জন্য একটি আরও নিরাপদ ও সুস্থ ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারবে।

ঘ) মুখ্য সুপারিশসমুহ

[স্বল্প-মেয়াদী] [মধ্য-মেয়াদী]

১. **সংবিধান সংশোধন :** [স্বল্প-মেয়াদী]

সংবিধান সংশোধনপূর্বক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য একটি পৃথক 'প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা আইন' প্রণয়ন করতে হবে, যা বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ব্যাপারে নাগরিকদের অধিকার ও রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্ধারণ করবে, এবং স্বাস্থ্যখাতে দীর্ঘমেয়াদে ন্যায্যতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

২. **আইনের সংস্কার:** [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

সকল সংশ্লিষ্ট পুরাতন আইন পর্যালোচনা করে যুগোপযোগী করতে হবে। এছাড়া রোগী সুরক্ষা, আর্থিক বরাদ্দ, জবাবদিহিতা ও জরুরি অবস্থায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। প্রস্তাবিত নতুন আইনসমূহ হল: বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন আইন; বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস আইন; জনস্বাস্থ্য ও অবকাঠামো আইন; বাংলাদেশ সেইফ ফুড, ড্রাগ, আইভিডি ও মেডিকেল ডিভাইস আইন; ঔষধের মূল্য নির্ধারণ ও প্রাপ্তি আইন; স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ও রোগী নিরাপত্তা আইন; এ্যালায়েড হেলথ প্রফেশনাল কাউন্সিল আইন; হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক এক্রেডিটেশন আইন; স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন; নারী স্বাস্থ্য আইন; ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ আইন; শিশু বিকাশ কেন্দ্র আইন; বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল আইন; স্বাস্থ্য তথ্য সুরক্ষা আইন ও স্বাস্থ্যখাতে টেকসই অর্থায়ন আইন। এছাড়াও নিম্নলিখিত আইনসমূহের সংশোধন প্রয়োজন: বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, মেডিকেল শিক্ষা এক্রেডিটেশন আইন, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল আইন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন, পৌর ও সিটি কপোরেশন আইন ইত্যাদি।

৩. **বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন গঠন :** [স্বল্প-মেয়াদী]

একটি স্বাধীন ও স্থায়ী "বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন (BHC)" প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই কমিশন স্বাস্থ্যবিষয়ক নীতি প্রণয়নে সংসদ ও সরকারকে কৌশলগত পরামর্শ দেবে। পাশাপাশি, এটি জাতীয় কৌশল, সেবা ও সেবাদানকারি প্রতিষ্ঠানের মানদণ্ড এবং ক্লিনিক্যাল গাইডলাইন প্রণয়ন করবে। কমিশন নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্যব্যবস্থার কার্যকারিতা, সেবার গুনগত মান এবং সার্বিক ব্যয়-সাশ্রয়িতা পর্যালোচনা করবে। এর ভিত্তিতে কমিশন বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সরকারকে উন্নয়নের জন্য গঠনমূলক মতামত ও দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। এই কমিশন সরাসরি সরকার প্রধানের নিকট জবাবদিহি করবে এবং প্রতি বৎসর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সংসদে পাঠাবে। এই কমিশন নিম্নোক্ত বিভাগসমূহ এ বিষয়ক তদারক ও গঠনমূলক দিকনির্দেশনা প্রদান করবে: ১. চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগ - স্নাতক ও স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং ও প্যারামেডিক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন; ২. জনস্বাস্থ্য বিভাগ - জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন, রোগ প্রতিরোধ; ৩. ক্লিনিক্যাল বিভাগ – স্বাস্থ্যসেবার ও রোগীর নিরাপত্তা তদারকি; ৪. BICE (Bangladesh Institute for Health and Care Excellence) – ক্লিনিকাল গাইডলাইন ও প্রটোকল উন্নয়ন, পাবলিক হেলথ গাইডলাইন উন্নয়ন; ৫. BHCI (Bangladesh Health Care Improvement) – সেবার মানদণ্ড, রোগীর নিরাপত্তা ও প্রটোকল অনুযায়ী সেবা প্রদান বিষয়ক নিয়মতান্ত্রিক তদারকি; ৬. রেগুলেটরি ওভারসাইট বিভাগ – BMDC, BMRC, BMEAC, ইত্যাদির ক্ষমতা বৃদ্ধি ও নেটওয়ার্ক গঠন; ৭. ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনস্টিক বিভাগ – মান নিয়ন্ত্রণ, স্বীকৃতি, ও National Diagnostic Network (NDN) তদারকি; ৮. নিরাপদ খাদ্য, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বিভাগ – ফার্মেসি নেটওয়ার্ক, আইভিডি-মেডিকেল ডিভাইস ও খাদ্য তদারকি; ৯. এনজিও (NGO) ও প্রাইভেট হাসপাতাল সমন্বয় বিভাগ – বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতের মান তদারকি ও সমন্বয়; ১০. CASH (Centre for Advanced Specialized Healthcare) – বিশেষায়িত সেবা কেন্দ্র: রোগীদের বিদেশমুখিতা রোধ ও দেশে আত্মনির্ভরশীল চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন (ক্যান্সার, কিডনি, লিভার ও অন্যান্য অঙ্গ প্রতিস্থাপন, হৃদযন্ত্রের শল্যচিকিৎসা, বন্ধ্যত্ব, ও দুর্লভ রোগ ইত্যাদি); ১১. Allied Health Professionals বিভাগ – টেকনোলজিস্ট, থেরাপিস্ট, কাউন্সেলর প্রমুখ পেশার মান উন্নয়ন; ১২. প্রথাগত ও বিকল্প চিকিৎসা বিভাগ – আয়ুর্বেদ, ইউনানি, হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি; ১৩. সেক্টোরাল হেলথ কোঅর্ডিনেশন বিভাগ - স্থানীয় সরকার, প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বরাষ্ট্র, রেলপথসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রায়শই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়হীনভাবে কাজ করে। এটি তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণ, সম্পদ বণ্টন এবং জরুরি সাড়া প্রদানে সহায়ক হবে। ১৪. স্বাস্থ্য

প্রযুক্তি মূল্যায়ন (Health Technology Assessment) বিভাগ – ব্যয় সাশ্রয়িতা, অর্থনৈতিক প্রভাব, বাজেট ও ক্রয় ব্যবস্থাপনা; ১৫. স্বাস্থ্য নিরীক্ষা ও দুর্নীতি বিরোধী বিভাগ – স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে কার্যকর তদারকি; ১৬. স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ - সেবাগ্রহীতার অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে একটি আধুনিক ডিজিটাল অভিযোগ নিষ্পত্তি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা; **BMDC, BNMC,** Bangladesh Pharmacy Council ইত্যাদির আইনগত ক্ষমতা ও কাঠামোকে আরও কার্যকর করা; চিকিৎসা প্রদানকারীদের নিরাপত্তা ও পেশাগত সুরক্ষা; মেডিকেল প্রফেশনাল ইন্স্যুরেন্স; পেশাগত অবহেলা বিষয়ে সুরক্ষা; স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি; এবং ১৭. আইন বিভাগ - সকল সংশ্লিষ্ট পুরাতন আইন পর্যালোচনা ও যুগোপযোগী করা, এবং নতুন আইনের সুপারিশ করা।

৪. **বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS) গঠন :** [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

ক) পেশাদারীত্ব, দক্ষতা ও জবাবদিহিমূলক সেবার মান নিশ্চিত করতে বিদ্যমান স্বাস্থ্য ক্যাডার, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ক্যাডার এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল জনবল নিয়ে প্রশাসনিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত ও পেশাভিত্তিক একটি নতুন সিভিল সার্ভিস - বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS) - গঠন করতে হবে। বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস-এর অধীনে ১১ টি আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ থাকবে; এর মধ্যে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে একটি করে মোট ৮টি, এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম- এ একটি করে মোট ৩টি। বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস-এর জন্য একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় গঠন করা হবে, যার নেতৃত্বে থাকবেন মুখ্য সচিব পদমর্যাদার একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক, যিনি চিফ অফ বিএইচএস (Chief of BHS) নামে অধিষ্ঠিত হবেন। তাঁর অধীনে জনস্বাস্থ্য, ক্লিনিকাল সেবা, এবং চিকিৎসা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা—এই তিনটি প্রধান খাত পরিচালনার জন্য জ্যেষ্ঠ সচিব পদমর্যাদার তিনজন উপপ্রধান নিযুক্ত হবেন, যারা ডেপুটি চিফ অফ হেলথ-DCH) নামে অধিষ্ঠিত হবেন। প্রতিটি খাতের অধীনে একজন করে মহাপরিচালক (DG) পদ সৃষ্টি করা হবে, যাঁরা সচিব-সমমানের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং কার্যক্রম পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ডেপুটি চীফ অব হেলথ-এর অধীনে কাজ করবেন। কর্মরত জনবলের জন্য একটি স্বতন্ত্র চাকরি বিধি ও পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে এবং যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন ভাতা পাবেন যাতে পেশাদারীত্ব, দক্ষতা ও জবাবদিহিমূলক সেবার মান নিশ্চিত হয়। বিদ্যমান বিসিএস ক্যাডারভুক্তদের জন্য নতুন বিএইচএস ক্যাডারে বেছে নেওয়া বা বিকল্প অপশন- এর সুযোগ রাখা হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

খ) বাংলাদেশ হেলথ সাভিস গঠনের জন্য DGHS, DG মেডিকেল এডুকেশন, পরিবার পরিকল্পনা, নার্সিং, টোব্যাকো কন্ট্রোল, হেলথ ইকোনমিক্স, TEMO ও NEMEW-সহ সব ইউনিটকে একীভূত করে একক "বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস (BHS)" গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। আলাদা সেক্রেটারিয়েট থাকবে না; সব ফাইল DG পর্যায় থেকে সরাসরি BHS-এর Deputy Chief ও Chief-এর কাছে যাবে, ফলে প্রশাসনিক কাজ হবে আরও দ্রুত, সমন্বিত ও দক্ষ। [স্বল্প-মেয়াদী]

গ) **বিকেন্দ্রীকরণ:** স্বাস্থ্যসেবার বিকেন্দ্রীকরণ করে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বাধীনতা দিতে হবে, এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্যের অবস্থা, স্বাস্থ্য সমস্যার ধরন ও রোগতাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তার আলোকে উপজেলা-ওয়ারি বাজেট ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। বিভাগীয় পর্যায়ের কার্যক্রম স্বশাসিত আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত হবে, যা নিয়ন্ত্রণ করবে বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস। জনবল নিয়োগ, বদলি নিয়ন্ত্রন ও ক্রয়-সংগ্রহ-আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য দায়-দায়িত্বের প্রয়োগযোগ্য বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।[মধ্য মেয়াদী]

৫. **স্বতন্ত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠন :** [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

ক) স্বাস্থ্যখাতের নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রক্রিয়া নিয়মিতকরণ ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠন করতে হবে। [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

খ) গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদের ক্ষেত্রে (যেমন চিফ অফ বিএইচএস, ডেপুটি চিফ অফ বিএইচএস, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ, মহাপরিচালক, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, BMDC ও BMRC চেয়ারম্যান ইত্যাদি) স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগের সুপারিশ করার জন্য উচ্চপর্যায়ের সার্চ কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি এই পদসমুহে নিয়োগপ্রাপ্তদের যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জাতীয় সংসদকে অবহিত করবে। এই উদ্যোগ জনস্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

৬. **প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা :** [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

ক) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সর্বজনীন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সরকারকে এই সেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে (বা ক্ষেত্রবিশেষে ভর্তুকিমূল্যে) প্রদান করতে হবে, যাতে কোনো নাগরিক আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত না হন। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কাঠামো শক্তিশালী করতে গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহকে একত্রিত করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রূপান্তর করতে হবে। শহরাঞ্চলে ওয়ার্ডভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ লক্ষ্যে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি খাত ও বেসরকারি খাতের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। প্রাথমিক সেবা চিকিৎসকের নেটওয়ার্ক গঠন করে শুন্যপদে প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসক/ জিপি/ পারিবারিক চিকিৎসক (Family Physician) -দের নিয়োগ করতে হবে, যা ইউনিয়ন থেকে উপজেলা পর্যন্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার প্রথম স্তরকে শক্তিশালী করবে। ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় জনবল, রোগনির্ণয় ব্যবস্থা, ঔষধ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জমাদির প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। প্রশিক্ষণের জন্য জেনেরিক কারিকুলাম অনুযায়ী BCPS, BCGP ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফ্যামিলি মেডিসিন কোর্স বা জিপি (GP) কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

খ) বিদ্যালয়ে এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানেও জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক অবহিতিকরণ ও সৃজনশীল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

৭. **হাসপাতাল ভিত্তিক সেবা : [মধ্য-মেয়াদী]**

ক. উপজেলা পর্যায়ে সেকেন্ডারি স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করে জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসেবাকে আরও সহজলভ্য করতে হবে।

খ. জেলা হাসপাতালগুলোতে বিশেষায়িত (টারশিয়ারি স্তরের) চিকিৎসাসেবা চালু করতে হবে, যাতে সেবার বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত হয়, মেডিকেল কলেজ ও জাতীয় ইনস্টিটিউটগুলোর ওপর রোগীর চাপ কমানো যায়, এবং ভৌগোলিক কারণে কেউ বিশেষায়িত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হন।

গ. প্রতিটি বিভাগীয় সদরে অন্তত একটি পূর্ণাঙ্গ, সর্বাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন ও বিশ্বমানের টারশিয়ারি সেবা হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে, যা জটিল ও বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য একটি আঞ্চলিক রেফারেল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। এ বিশেষায়িত হাসপাতালগুলি মেডিকেল কলেজ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়। এই হাসপাতালগুলো নতুনভাবে গড়ে তোলা যেতে পারে, অথবা বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধাপে ধাপে উন্নীত করে করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ, সামাজিক ব্যবসা মডেল ও বিদেশি যৌথ বিনিয়োগ সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এই হাসপাতালগুলোতে বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্যসেবা-কে বিশেষ অগ্রাধিকার দিতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ঘ. প্রতি রোগীর জন্য গড়ে ১০ মিনিটের পরামর্শ সময় নিশ্চিত করতে হবে, এজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেবা প্রদানকারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং সাপ্তাহিকভাবে প্রেসক্রিপশন নমুনা যাচাই পদ্ধতি চালু করা হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ঙ. অতি দরিদ্র বা যারা দেশের মোট জনসংখ্যার ২০%, তারা সব হাসপাতালে বিনামূল্যে সব সেবা পাবেন।

চ. দেশের সব সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি হাসপাতালের রক্ত সঞ্চালন সেবা, ল্যাবরেটরী সেবা ও ফার্মেসী ২৪/৭ খোলা থাকবে।

ছ. সরকারি প্রয়োজনে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিসহ সকল স্তরের সেবাপ্রদানকারী কর্মচারীদের বিধি অনুযায়ী বদলি করা যাবে।

জ. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কার্যক্রমসমূহ জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত হবে, যা নিয়ন্ত্রণ করবে বিভাগীয় পর্যায়ের বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস। [মধ্য-মেয়াদী]

ঝ. হাসপাতালে মানোন্নয়নের জন্য কার্যকরী মান উন্নয়ন পর্ষদ ও কন্টিনিউড এডুকেশন পদ্ধতির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮. **অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের প্রাপ্যতা:** [স্বল্প মেয়াদী]

ক) অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সর্বজনীন প্রাপ্যতাকে একটি মৌলিক স্বাস্থ্য অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। দেশের সকল নাগরিককে প্রয়োজনের ভিত্তিতে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ বিনামূল্যে (যথা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পর্যায়ে এবং অতি দরিদ্রের ক্ষেত্রে) বা ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করতে হবে। এজন্য সরকারি ওষুধ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী করতে হবে। বেসরকারি খাত থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত ঔষধ সংগ্রহে

কৌশলগত ক্রয়ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ফার্মেসি ২৪ ঘণ্টা চালু রাখতে হবে। এই ফার্মেসিগুলো জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক-এর আওতায় পরিচালিত হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

খ) অ্যান্টি-ক্যান্সার, অ্যান্টি-ডায়াবেটিক, অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ ও অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকাভুক্ত অ্যান্টিবাইয়োটিকের ওপর ভ্যাট এবং প্রযোজ্য অন্যান্য শুল্ক ও কর শূন্য হবে। অন্যদিকে, ভিটামিন, মিনারেলস, ব্রেস্ট মিল্ক সাবস্টিটিউট ও প্রোবায়োটিকসহ স্বাস্থ্য-সম্পূরক ও উচ্চমূল্যের ঔষধের ওপর ভ্যাট ও শুল্ক বৃদ্ধি করতে হবে। এর মাধ্যমে একদিকে জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধের প্রাপ্যতা বাড়বে, অন্যদিকে তুলনামূলক কম-প্রয়োজনীয় ও বিলাসমূলক পণ্যে কর বাড়িয়ে রাজস্ব আয় জোরদার করা যাবে। [স্বল্প মেয়াদী]

৯. **জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ক:** [স্বল্প মেয়াদী]

জরুরি চিকিৎসাকে একটি বিশেষায়িত ও অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা হিসেবে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একে একটি স্বীকৃত চিকিৎসা বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগসমূহ পর্যায়ক্রমে এই বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে পরিচালিত হতে হবে, যাতে জরুরি চিকিৎসাসেবার পরিসর ও মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

১০. **স্বাস্থ্য পরিষেবা সহায়ক নেটওয়ার্ক:** [স্বল্প-মেয়াদী]

স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলোর প্রাপ্যতা, মান ও পরিব্যাপ্তি নিশ্চিত করতে **জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক**, **জাতীয় ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি নেটওয়ার্ক, জাতীয় রক্ত সঞ্চালন নেটওয়ার্ক** এবং **জাতীয় অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক** গঠন করতে হবে। এই পরিষেবাগুলো নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী স্ব স্ব ক্ষেত্রে একটি একীভূত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সারাদেশে সংযুক্ত থাকবে এবং পরিচালিত হবে, যাতে জনগণ সহজে, দ্রুত ও নির্ভরযোগ্যভাবে এই পরিষেবাগুলো পেতে পারেন। [স্বল্প-মেয়াদী]

১১. **স্বাস্থ্য সুরক্ষা:**

সেবাগ্রহীতার অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে একটি আধুনিক ডিজিটাল অভিযোগ নিষ্পত্তি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হবে। BMDC, BNMC, Bangladesh Pharmacy Council, Allied Health Professional Council - ইত্যাদির আইনগত ক্ষমতা ও কাঠামোকে আরও কার্যকর করা হবে ।

চিকিৎসা প্রদানকারীদের নিরাপত্তা ও পেশাগত সুরক্ষা (স্বাস্থ্য সুরক্ষা নীতির অংশ) -- ১. মেডিকেল প্রফেশনাল ইন্স্যুরেন্স: চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য মেডিকেল প্রফেশনাল ইন্স্যুরেন্স চালু করা হবে, যাতে কর্মজীবনে আইনি ঝুঁকি বা অপ্রীতিকর ঘটনার ক্ষেত্রে তাদের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। ২. পেশাগত অবহেলা (Professional Negligence) বিষয়ে সুরক্ষা: BMDC, BNMC, Bangladesh Pharmacy Council, Allied Health Professional Council ইত্যাদি)-র পূর্বানুমতি ছাড়া কোনো চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে গ্রেফতার করা যাবে না। শুধুমাত্র অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য হবে, তবে তা অভিযোগ দাখিলের নব্বই দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে ।

স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা: বাংলাদেশ পুলিশের অধীনে একটি নির্দিষ্ট ইউনিট থাকবে যেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংরক্ষিত কিছু পুলিশ থাকবেন (যাদের মেডিকেল পুলিশ বলা যেতে পারে) যারা জরুরী পরিস্থিতিতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। হাসপাতাল ও ক্লিনিকে অনাকাঙ্ক্ষিত হামলা, হুমকি ও সহিংসতা প্রতিরোধে এই ইউনিট কাজ করবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

১২. **চিকিৎসা শিক্ষা সংস্কার:** [স্বল্প ও মধ্য-মেয়াদী]

চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত, নীতিনির্ভর এবং কাঠামোগত সংস্কার অপরিহার্য। নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

জনস্বাস্থ্য চাহিদা, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, প্রতিষ্ঠান সক্ষমতা এবং World Federation for Medical Education (WFME)-এর গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে দেশের সকল মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম নিয়মিত মূল্যায়ন করতে হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন, প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ও আসন সংখ্যা পুনর্বিন্যাস করতে হবে। মানহীন সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বন্ধ করতে হবে। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতি এড়াতে তাদের অন্যান্য স্বীকৃত মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরের (transfer) ব্যবস্থা করতে হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথ উদ্যোগে (joint venture) বাংলাদেশে মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে WFME-এর মানদণ্ড অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

পাঁচ দিনের একাডেমিক সপ্তাহ চালু করে শিক্ষার কাঠামো উন্নত করতে হবে, যাতে ছাত্রদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষকদের ওপর কাজের চাপ কমে। ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তি প্রক্রিয়ায় অপ্রয়োজনীয় বাধা অপসারণ করে 'ব্রেইন ড্রেইন' রোধ এবং প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের দেশে ফিরে আসার সুযোগ তৈরি করতে হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

FCPS ও MD/MS কোর্সসমূহে পাঠ্যক্রমে সমন্বয় (curricular alignment) আনতে হবে এবং দেশ-বিদেশে পারস্পরিক স্বীকৃতি (reciprocal recognition) নিশ্চিত করে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান বৃদ্ধি করতে হবে। [স্বল্প মেয়াদী]

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে Competency-Based Medical Education (CBME) এবং Community-Oriented Medical Education (COME) কার্যকরভাবে চালু করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত আচরণে পূর্ণ সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। [মধ্য-মেয়াদী]

১৩. **চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার:** [স্বল্প ও মধ্য-মেয়াদী]

ক. বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি (BMU), অন্যান্য মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস), প্রাথমিক পর্যায়ে পুরানো আটটি সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং পরবর্তীতে সকল মেডিকেল কলেজ, ও বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের জন্য Bangladesh Health Commission (BHC) - এর Medical Education Wing-এর অধীনে পৃথক ও স্বায়ত্তশাসিত শাসন কাঠামো গঠন করা হবে। বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি আইনের সংস্কার করে কার্যকর পরিচালন কাঠামো নিশ্চিত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

খ. বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি ও অন্যান্য মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-সংযুক্ত হাসপাতালসমূহ (University Hospitals) সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে নিজস্ব বোর্ড অব গভর্ন্যান্স-এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে, যাতে নীতিনির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত হয়। [মধ্য-মেয়াদী]

গ. ভবিষ্যতে একক ও সমন্বিত কাঠামোর ভিত্তিতে একটি স্বায়ত্তশাসিত মেডিকেল ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, যা দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সামগ্রিক ও সমন্বিত উন্নয়ন ও গবেষণাকে সুসংহতভাবে এগিয়ে নিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ঘ. বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস) - কে পরিগণ্য (Deemed) বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব করা হচ্ছে। বিসিপিএস-এ কাউন্সিল সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রতিটি বিশেষজ্ঞ শাখার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে, যাতে নীতিনির্ধারণে পেশাগত অন্তর্ভুক্তি ও বহুমাত্রিকতা বজায় থাকে। এই কাঠামোর আওতায় বিসিপিএস -এর প্রতিটি ফ্যাকাল্টিকে সাব-কলেজে রূপান্তরিত করে একাডেমিক স্বায়ত্তশাসনসহ প্রশ্ন ব্যাংক, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন ইউনিট ও রিসার্চ কোঅর্ডিনেশন সেল পরিচালনা করবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ঙ. NICVD, NITOR, NIKDU, ICMH, NIMH, NICRH, NIDCH, NIPSOM, IEDCR, IPH, IPHN ইত্যাদি সহ জাতীয় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে এবং প্রধানদের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদায় নিয়োগ করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

চ. স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলি এনজিও ব্যুরোর পরিবর্তে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশনের মাধ্যমে সরাসরি স্থানীয় ও বিদেশি তহবিল গ্রহণ করতে পারবে এবং তা গবেষণা ও সেবা প্রদানে সঠিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নিয়মিত অডিট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ছ. সকল টারশিয়ারি ও কোয়ার্টনারি হাসপাতালসমূহে ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড চালু করে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় গতি, নির্ভুলতা ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

জ. সেবা প্রদানকারী হাসপাতাল ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রদানকারী হাসপাতালকে, ধারণা ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে, পৃথকভাবে পরিচালনা করতে হবে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং অন্যান্য শিক্ষা-প্রশিক্ষণ হাসপাতালগুলোর কাঠামোগত সংস্কার করতে হবে, যাতে তাদের প্রধান কার্যক্রম শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের উপর কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে চিকিৎসা শিক্ষা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে উৎকর্ষতা অর্জনের পথ প্রশস্ত হবে এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থায় জ্ঞানভিত্তিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা যাবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ঝ. সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার অধ্যক্ষের নেতৃত্বে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হবে, যা কলেজ ব্যবস্থাপনা,কলেজের কোর্স কারিকুলাম, তার বাস্তবায়ন ও শিক্ষার মান নিশ্চিত করবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঞ. প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ আইন সংস্কার: স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সরকারি তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করতে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ আইনের আওতায় বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিস থেকে কো-চেয়ারপারসন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

১৪. **জনবল সংস্কার :** [মধ্য-মেয়াদী]

ক) যেসব বিষয়ে জনবল সংকট প্রকট (যেমন: মেডিকোলিগ্যাল, অন্যান্য ক্লিনিক্যাল ও বেসিক সাবজেক্ট), সেখানে আগ্রহ সৃষ্টি ও জনবল ধরে রাখতে বিশেষ ভাতা এবং উপযুক্ত আর্থিক ও অন্যান্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) সকল বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র পূর্ণকালীন শিক্ষক ক্যাটেগরি চালু করতে হবে। এই ক্যাটেগরির জন্য নন-প্র্যাকটিসিং ভাতা ও অতিরিক্ত প্রণোদনা প্রদান করতে হবে, যাতে শিক্ষকরা শিক্ষা ও গবেষণায় পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন। এর ফলে এই খাতে দীর্ঘমেয়াদে পেশাগত উৎকর্ষতা নিশ্চিত করা যাবে।

গ) স্বাস্থ্য অবকাঠামোর বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করতে হবে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে বেতন ভাতাদি দিতে হবে। পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা, দুর্গম এলাকায় সেবা ও প্রশিক্ষণ, এবং নির্ধারিত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সেবা প্রদান-কে বিবেচনা করা হবে; এর ব্যত্যয় ঘটলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) দুর্গম এলাকায় সেবা প্রদানের জন্য সেবা প্রদানকারীদের বিশেষ ভাতা এবং বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ) প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস' কাঠামো এবং অন্যান্য সেবা ও পরিষেবা সংক্রান্ত সুপারিশের আলোকে সারাদেশে স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় জনবলের ধরন ও পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিদ্যমান শূন্যপদগুলো, প্রয়োজনে ব্যক্তিখাতের সেবাপ্রদানকারীদের চুক্তির মাধ্যমে, অবিলম্বে পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় নতুন পদ সৃষ্টি ও জনবল নিয়োগের উদ্যোগ নিতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

১৫. স্বাস্থ্যসেবায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়: [স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী]

ক. বাংলাদেশে একটি কার্যকর ও টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে, সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ, মান ও দক্ষতা বাড়াতে সামাজিক ব্যবসার মডেল প্রয়োগের জন্য সঠিক নীতিমালা ও অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এতে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, স্বাস্থ্যসেবা জনমুখী ও সহজলভ্য হবে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও কার্যকর ও টেকসই হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

খ. বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্সিং ও প্রশাসনিক কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটি "একক সেবা কেন্দ্র" চালু করতে হবে। করছাড়, প্রণোদনা ও সহজতর নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

গ. মাননির্ভর গ্রেডিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং এজন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেবার স্বীকৃতিতে অ্যাক্রিডিটেশন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যেখানে নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট (ICU) ব্যবহারের মান, হাসপাতালে সংক্রমণের হার ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবস্থাপনার ওপর নজরদারি থাকবে। প্রতিটি ৫০ শয্যার হাসপাতালে একজন সিনিয়র চিকিৎসকের নেতৃত্বে ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সেবার মান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের তদারকি ও সেবার পরিমাণ, মান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং অপ্রয়োজনীয় সেবা ও প্রেসক্রিপশন মান নিয়ন্ত্রণে, অন্যন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সাথে, মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন, ক্লিনিকাল সেবা অধিদপ্তরের (প্রস্তাবিত) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিকস)। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঘ. বেসরকারি হাসপাতাল সম্প্রসারণ: রোগীদের বিদেশমুখিতা রোধ ও দেশে আত্মনির্ভরশীল চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্পর্কে প্রশিক্ষিত (কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ও অন্যান্য অঙ্গ প্রতিস্থাপন, ক্যান্সার, কার্ডিয়াক সার্জারি, বন্ধ্যত্ব, ও দুর্লভ রোগ চিকিৎসা ইত্যাদি)-র উন্নয়ন, চিকিৎসায় করছাড়, আমদানিতে সুবিধা ও অর্থনৈতিক প্রণোদনা দিতে হবে। প্রয়োজনে সরকার বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত্ব (PPP) ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন, ঝুঁকি বণ্টন ও সেবার মান উন্নয়ন করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

১৬. স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য বেতন বোর্ড: [স্বল্প-মেয়াদী]

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশনের অধীনে ইন্টার্ন চিকিৎসক, স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রী (ভাতা), বেসরকারি চিকিৎসক, নার্স, ও সব ধরনের স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য একটি সুসংগঠিত এবং যুগোপযোগী বেতন কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে। এই কাঠামো প্রণয়ন করলে, কর্মীদের আর্থিক স্থায়িত্ব এবং চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এটি স্বাস্থ্য সেবা কর্মীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী উৎসাহ এবং কাজের পরিবেশের উন্নতি করতে সহায়তা করবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

১৭. সমন্বিত ও সরক্ষিত স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা:[স্বল্প-মেয়াদী] ও **[মধ্য-মেয়াদী]**

বাংলাদেশে একটি সম্পূর্ণ কাগজবিহীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্যখাতের সব সেবা ও ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করতে হবে।

ক) স্বাস্থ্য তথ্যকে একটি রাষ্ট্রীয় সম্পদ, জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ও নাগরিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। এজন্য একটি স্বাস্থ্য তথ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে যেন ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। সরকার, বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহণে একটি জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য পরিষদ গঠন করতে হবে, যাতে একটি শক্তিশালী স্বাস্থ্য তথ্য শাসন কাঠামো গড়ে ওঠে এবং ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। [স্বল্প-মেয়াদী]

খ) বিদ্যমান খন্ডিত, অপর্যাপ্ত এবং বিদেশি প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থা থেকে সরে এসে একটি একীভূত ডিজিটাল স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা (প্ল্যাটফর্ম) 'স্বাস্থ্য-সেতু' গড়ে তুলতে হবে, যা সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করবে। এই প্ল্যাটফর্মে প্রতিটি নাগরিকের জন্য ইউনিক হেলথ আইডি চালু করতে হবে, যার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে একটি স্মার্ট 'স্বাস্থ্য-চাবি' কার্ড, যাতে রোগীর যাবতীয় স্বাস্থ্যতথ্য ও সেবার ইতিহাস থাকবে। এই প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত থাকবে: 'স্বাস্থ্য-বৃত্তান্ত': একটি ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড (EHR) ব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের চিকিৎসা ইতিহাস, প্রেসক্রিপশন, ল্যাব রিপোর্ট ও চিকিৎসকের পরামর্শ ডিজিটালি সংরক্ষিত থাকবে; 'স্বাস্থ্য-চিত্র': ডিজিটাল রেডিওলজি ও ইমেজিং শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম, যাতে এক হাসপাতালের করা এক্স-রে বা সিটি স্ক্যান সহজে অন্য কোথাও দেখা ও বিশ্লেষণ করা যায়; 'স্বাস্থ্য-উপকরণ': লজিস্টিক ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম, যা ওষুধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সামগ্রী ও চিকিৎসা সরঞ্জামের স্টক ট্র্যাকিং ও স্বয়ংক্রিয় চাহিদা নিরূপণে ব্যবহৃত হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

গ) সারাদেশে একটি একীভুত ই-প্রেসক্রিপ্সন ব্যবস্থা চালু করতে হবে - যা 'স্বাস্থ্য-সেতু'-র সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত থাকবে। সকল চিকিৎসকের জন্য এই একীভুত ই-প্রেসক্রিপ্সন ব্যবহার বাধ্যতামুলক করতে হবে এবং ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঘ) সারাদেশে 'স্বাস্থ্য-সাক্ষরতা' কর্মসূচি চালু করে জনগণকে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহারে সক্ষম করে তুলতে হবে। গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য চালু করতে হবে একটি mHealth অ্যাপ 'স্বাস্থ্য-বিকাশ', যার মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরামর্শ, ভ্যাকসিন নোটিফিকেশন, গর্ভবতী মা ও শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট বার্তা, এবং টেলিমেডিসিন সেবা সরাসরি মোবাইলে পাওয়া যাবে। ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্রকৌশলকে একটি স্বতন্ত্র পেশাগত ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ঙ) সকল সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও পরিষেবাগুলোকে (জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক, জাতীয় ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি নেটওয়ার্ক, জাতীয় রক্ত সঞ্চালন নেটওয়ার্ক এবং জাতীয় অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক) ধাপে ধাপে 'স্বাস্থ্য-সেতু'-তে একীভূত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও হাসপাতালের বহির্বিভাগ সেবা, নির্ধারিত অন্তঃবিভাগ সেবা, জাতীয় ফার্মেসি নেটওয়ার্ক, ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। [স্বল্প-মেয়াদী]

চ) প্রতিটি বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে 'স্বাস্থ্য-সেতু'-তে সংযুক্ত হতে বাধ্য করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

ছ) স্বাস্থ্যখাতের তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ সক্ষমতা বাড়াতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে রোগভিত্তিক নিবন্ধন (Disease Registry) চালু করতে হবে, যাতে রোগ প্রবণতা, জটিলতা ও খরচ বিশ্লেষণ করা যায়। এক্ষেত্রে ক্যান্সার, কিডনি ডায়ালাইসিস, ডায়াবেটিস, অবস্ট্রেটিক ফিস্টুলা, বিরলরোগ, ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে AI ও মেশিন লার্নিং একীভূত করে ভবিষ্যৎ ঝুঁকি শনাক্ত ও প্রতিরোধমূলক পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এর জন্য একটি স্বতন্ত্র হেলথ ইনফরমেটিক্স ইউনিট গঠন প্রয়োজন, যারা এই বিশ্লেষণগুলো করে নীতিনির্ধারকদের সিদ্ধান্তে সহায়তা করবে। [মধ্য-মেয়াদী]

১৮. **স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত, ন্যায্য ও টেকসই অর্থায়ন:**

ক) স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত, ন্যায্য এবং টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে হবে, যা "স্বাস্থ্যখাতে টেকসই অর্থায়ন আইন" নামে পরিচিত হতে পারে। এর মাধ্যমে একটি আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যাবে, যাতে সরকার প্রতি বছর মোট জাতীয় আয়ের (GDP) অন্তত ৫ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দিতে বাধ্য থাকে। এছাড়া, এই আইন নিশ্চিত করবে যে, স্বাস্থ্যখাত বার্ষিক বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত পাঁচটি খাতের একটি হিসেবে বিবেচিত হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

খ) জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিকে এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে স্বাস্থ্যকে একটি পাবলিক গুড (public good) এবং মেরিট গুড (merit good) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। একে জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়নের একটি কৌশলগত চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এই নীতিমালায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে যে, সকল অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, জাতীয় কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত টিকা, অত্যাবশ্যকীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং স্বাস্থ্য তথ্যব্যবস্থা- এসবই জাতীয় নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও সহনশীলতা জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ উপাদানগুলোতে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

গ) একটি পর্যাপ্ত, ন্যায্য ও টেকসই অর্থায়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে "সকল নীতিতে স্বাস্থ্য" (Health in All Policies - HiAP) এই ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। HiAP -এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য—জাতীয় ও খাতভিত্তিক নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যখাতে অবদান এবং স্বাস্থ্য প্রভাব মূল্যায়ন (health impact assessments) বাধ্যতামুলক করতে হবে; স্বাস্থ্যবান্ধব রাজস্ব নীতি (health-promoting fiscal policies) গ্রহন করতে হবে.

ঘ) স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন কৌশলকে সার্বিকভাবে পরিবর্তন করতে হবে, যেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে এর মূল ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করে ব্যক্তিপর্যায়ে ব্যয়ের ঝুঁকি, বিশেষ করে বিপর্যয়কর চিকিৎসা ব্যয় কমাতে লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি চালু করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঙ) কর আদায় সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ট্যাক্স-টু-জিডিপি অনুপাত বাড়াতে হবে, এবং সর্বোচ্চ আয়শ্রেণি থেকে আদায়কৃত করের অন্তত ৫% স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের জন্য নির্ধারিত করতে হবে। স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভোগ্যপণ্যের ওপর আবগারি কর আরোপ/বৃদ্ধি করতে হবে এবং স্বাস্থ্যখাতে এর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ দিতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসবহুল পণ্য ও সেবার ওপর পৃথক স্বাস্থ্য কর চালু করতে হবে। জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তহবিল (National Health Impact Fund) গঠন করতে হবে এবং বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানের CSR বাজেটের নির্দিষ্ট অংশ (>২০ শতাংশ) বাধ্যতামূলকভাবে এই তহবিলে জমা করতে হবে। স্বাস্থ্যখাতের অর্থায়নের জন্য উদ্ভাবনী উৎস হিসেবে সামাজিক ব্যবসা মডেল এবং প্রবাসী বাংলাদেশি ডিসপরা বন্ড গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।

চ) সরকারি রাজস্বে শতভাগ অর্থায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে সর্বজনীন ও বিনামূল্যে নিশ্চিত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

ছ) ব্যয়বহুল চিকিৎসায় আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা 'স্বাস্থ্য-কবচ' চালু করতে হবে। এই বীমা কাঠামোতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে বিপর্যয়কর ব্যয়ের প্রধান কারণ—যেমন ক্যান্সার, হৃদরোগ, কিডনি ডায়ালাইসিস ও মারাত্মক দুর্ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রাথমিকভাবে সকল সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী ও তাদের পরিবারবর্গ, এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বাধ্যতামূলকভাবে 'স্বাস্থ্য-কবচ'-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী] অনানুষ্ঠানিক খাতকে ধাপে ধাপে এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সামাজিক স্বাস্থ্যবীমা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করা। সার্বজনীন স্বাস্থ্য বীমার জন্য একটি স্বাস্থ্য বীমা কর্তৃপক্ষ গঠন করা । [মধ্য-মেয়াদী]

জ) প্রয়োজন ও চাহিদাভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে স্বাস্থ্য বাজেটের >৫০% বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঝ) জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা অফিস (NHSO) গঠন করতে যাতে কৌশলগত ক্রয়ক্ষমতা (STRATEGIC PURCHASING) জোরদার হয় এবং 'স্বাস্থ্য-কবচ' এর যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়। [মধ্য-মেয়াদী]

ঞ) কার্যকরিতা ও ব্যয়-সাশ্রয়িতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি স্বাস্থ্য প্রযুক্তি মূল্যায়ন ইউনিট (HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT – HTA UNIT) গঠন করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

ট) স্বাস্থ্যখাতের সকল ক্রয়ে বাধ্যতামূলক ই-জিপি (ELECTRONIC GOVERNMENT PROCUREMENT – E-GP) চালু করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঠ) সরকারি হাসপাতালসমূহে ধাপে ধাপে আর্থিক স্বায়ত্তশাসন চালু করে ব্যবহারকারী ফি সংরক্ষণ ও হাসপাতালের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সরঞ্জাম ক্রয়ে ব্যবহারের ক্ষমতা দিতে হবে। পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে স্বাধীনতার পরিসর বাড়ানো যেতে পারে। [মধ্য-মেয়াদী]

ড) ব্যয়-সাশ্রয়িতা বৃদ্ধি ও অপচয় রোধের জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবেঃ

- হাসপাতাল ও প্রাথমিক সেবাকেন্দ্রে ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট নিয়োগ করতে হবে যাতে ওষুধের যৌক্তিক ব্যবহার ও ব্যয়-সাশ্রয়িতা নিশ্চিত করা যায়। [স্বল্প-মেয়াদী]
- 'ন্যাশনাল এসেনশিয়াল ডায়াগনস্টিক লিস্ট' প্রণয়ন করতে হবে এবং এই নির্ধারিত পরীক্ষাগুলোর জন্য স্থান ও প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে মূল্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- জরুরি সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে একটি জাতীয় অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]
- রেফারেল ব্যবস্থাকে কাঠামোবদ্ধ, বাধ্যতামূলক ও কার্যকর করতে হবে। সরকারি হাসপাতালে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত প্রাথমিক সেবা চিকিৎসকের রেফারেল বাধ্যতামূলক করতে। এই বাধ্যবাধকতা জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। [স্বল্প-মেয়াদী]
- ওষুধ ব্যবস্থাপনা, যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার ও ব্যয়-সাশ্রয়িতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সার্বিকভাবে 'ই-প্রেসক্রিপশন' ব্যবস্থা চালু করতে হবে।[স্বল্প-মেয়াদী]
- সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ব্যক্তি পর্যায়ে সেবাদানকারী চিকিৎসকদের মধ্যে প্রেসক্রিপশন নিরীক্ষা চালু করতে হবে এবং নিরীক্ষার ফলাফল ব্যবহার করে আর্থিক অপচয় রোধ ও সেবার মান উন্নয়নে নিয়মিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

১৯. **ঔষধ ও প্রযুক্তিঃ** [মধ্য-মেয়াদী]

জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিবেচনায় মানসম্মত এপিআই, ভ্যাকসিন, আইভিডি, এবং মেডিকেল ডিভাইস উৎপাদনে দেশীয় স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং আমদানি নির্ভরতা কমাতে এই খাতে গবেষণা ও উৎপাদন সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজনে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের যৌথ বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে হবে। এজন্য পর্যাপ্ত প্রণোদনা, স্বল্পসুদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, ট্যাক্স ও ভ্যাট ছাড়সহ প্রয়োজনীয় নীতিগত সুবিধা প্রদান করতে হবে। দেশীয় শিল্প যখন নির্ধারিত উৎপাদন সক্ষমতা ও চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে, তখন উচ্চহারে আমদানি শুল্ক আরোপের মাধ্যমে আমদানি ধাপে ধাপে সীমিত এবং পরবর্তীতে নিরুৎসাহিত করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২০. **বিদেশে চিকিৎসা নির্ভরতা হ্রাস এবং মেডিকেল ট্যুরিজম উন্নয়ন:**

প্রতিবছর বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং বিদেশগামী রোগীর সংখ্যা হ্রাসের লক্ষ্যে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ক্যান্সার চিকিৎসা, অঙ্গ প্রতিস্থাপন সার্জারি, হৃদরোগ, জটিল কিডনি রোগ, বন্ধ্যাত্ব ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত রোগনির্ণয়ের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন উৎকর্ষকেন্দ্র (Centers of Excellence) প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়া হবে, যাতে দেশেই উচ্চমানের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা যায়। এই উদ্যোগের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP)-কে উৎসাহ দিতে হবে এবং উচ্চপ্রযুক্তি-নির্ভর বিশেষায়িত হাসপাতালে বিনিয়োগ সহযোগিতা করতে হবে। দক্ষ জনবল উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (যেমন: JCI, ISO) অর্জন এবং সেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় স্বাস্থ্যসেবায় জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। [মধ্য-মেয়াদী]

একইসঙ্গে, মেডিকেল ট্যুরিজম সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিকল্পিত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এ জন্য রোগনির্ণয়ের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দেশের পুরাতন ল্যাবরেটরীগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২১. **ফুড, ড্রাগ, ও আইভিডি-মেডিকেল ডিভাইস প্রশাসন গঠন:**

একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে তিনটি শাখা থাকবে: ঔষধ-টিকা-প্রসাধনী, আইভিডি-মেডিকেল ডিভাইস, ও নিরাপদ খাদ্য। [স্বল্প-মেয়াদী]

ক. ঔষধ-টিকা-প্রসাধনী খাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতি দুই বছর অন্তর অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা পর্যালোচনা, অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (API)-এর মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণ, স্থানীয় রোগীদের উপর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ও বায়োএভেইলিবিলিটি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ নিরীক্ষা কমিটি গঠন, এবং বৈদেশিক যৌথ বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান। [মধ্য-মেয়াদী]

খ. আইভিডি-মেডিকেল ডিভাইস খাতে মধ্য-মেয়াদে টেলিমেডিসিন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন একটি মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি, নীতিমালা হালনাগাদ, স্থানীয় উদ্ভাবনকে উৎসাহ প্রদান, পুরনো যন্ত্রপাতি পরিত্যাগ এবং বৈদেশিক যৌথ বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

গ. খাদ্য নিরাপত্তা খাতে সংক্ষিপ্ত-মেয়াদে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (Food Safety Authority)-কে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানান্তর, ২০১৩ সালের খাদ্য আইন হালনাগাদ, খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে ট্রেসেবিলিটি চালু, স্থানীয় পর্যায়ে অফিসার নিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নিশ্চিতকরণ। [স্বল্প-মেয়াদী]

ঘ. চিকিৎসক-ফার্মাসিউটিক্যাল সম্পর্কিত নীতি: [মধ্য-মেয়াদী]

World Medical Association (WMA)-এর প্রস্তাবনার আলোকে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা দেয়া হচ্ছে, যাতে করে মধ্য-মেয়াদে একটি নৈতিক ও ভারসাম্যপূর্ণ চিকিৎসক-ফার্মাসিউটিক্যাল সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়:

১. ঔষধের নমুনা বা উপহার প্রদান করে কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে; ২. মেডিকেল কনফারেন্স আয়োজনের পূর্বে অবশ্যই বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (BMEAC) অনুমোদিত CPD ক্রেডিট পয়েন্ট গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে **এবং** মেডিক্যাল কনফারেন্সের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব ট্যাক্স অফিসে জমা দিতে হবে এবং এর একটি কপি বিএমইএসি-তে জমা দিতে হবে; ৩. কনফারেন্সে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির অংশগ্রহণ:- ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো অনুমোদিত কনফারেন্সে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে পারবে, তবে কেবলমাত্র প্রদর্শনী এলাকায় পণ্যের উপস্থাপনার জন্য তাদের প্রতিনিধির শারীরিক উপস্থিতি অনুমোদিত থাকবে। কোনো ধরনের খাবার, উপহারের ব্যাগ বা অন্য কোনো উপহার সামগ্রী সরবরাহ ও ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধূলা, রাফেল ড্র ইত্যাদি করতে পারবে না; ৪. ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো শুধুমাত্র ডাক্তারদের ই-মেইল বা ডাকযোগের মাধ্যমে তাদের পণ্য সম্পর্কিত তথ্য পাঠাতে পারবে।প্রতিনিধিরা সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে দৈনন্দিন প্রোডাক্ট প্রমোশন করতে পারবে না; ৫. চিকিৎসকের চেম্বার বা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে কোনো ধরনের ঔষধের/ পণ্য প্রচার কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে, কারণ এসব কর্মকাণ্ডে চিকিৎসকের মনোযোগ বিঘ্নিত হয় এবং রোগীরা সঠিকভাবে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হন; ৬. চিকিৎসকদের যেকোনো পেশাগত সংগঠন, যেমন—চিকিৎসক সমিতি, পেশাগত সংস্থা বা বিশেষজ্ঞ সমাজ (Professional Associations or Societies)—এ কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে থাকতে পারবে না; ও ৭. নতুন ওষুধ বা নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য থাকলে তা প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক না করে কেন্দ্রীয়ভাবে নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক সভার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২২. **ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার: [মধ্য-মেয়াদী]**

ই-জিপি চালু, স্বাধীন নিরীক্ষা, স্বাস্থ্য সমস্যার আলোকে স্থানীয়ভাবে বাস্তবসম্মত বাজেট ব্যবস্থাপনা, পারফরম্যান্সভিত্তিক প্রণোদনা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর চাহিদা পূর্বাভাস চালু করতে হবে এবং সে অনুযায়ী ক্রয় সংগ্রহ কাজ সম্পাদিত হতে হবে। বাজেট প্রাক্কলনে উন্নয়ন, রাজস্ব ও পরিচালনা ভিত্তিক বাজেট এক সাথেই প্রতিফলিত হতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা, বাজেট, ও কমর্সূচীর পর্যালোচনা করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২৩. **দুর্নীতি প্রতিরোধ :**

ক. প্রতিটি মহাপরিচালকের দপ্তরে অবস্থিত স্বাধীন ইন্টারনাল অডিট ইউনিট অধিকতর শক্তিশালী এবং কার্যকর করতে হবে। [স্বল্প-মেয়াদী]

খ. কোন চিকিৎসক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হাসপাতাল সেবা, ঔষধ, রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষার পরামর্শ দিবেন না। কোন ঔষধ কোম্পানীর প্যাডে ঔষধের নিদান (প্রেসক্রিপশন) লিখবেন না।

২৪. **স্বাস্থ্য গবেষণা:** [স্বল্প-মেয়াদী]

দেশের স্বাস্থ্য গবেষণার নৈতিক মান উন্নয়ন ও প্রমিতকরণ, গবেষণা সংক্রান্ত নীতিমালা ও গাইড লাইন প্রণয়ন, গবেষণা অনুদান ব্যবস্থাপনা, যথাযথ আইনের অধীনে BMRC-র অবকাঠামোগত ও আর্থিক-প্রশাসনিক সামর্থ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হলো। জাতীয় বাজেটের স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দের নুন্যতম ২.৫% স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার জন্য ব্যয় করতে হবে। এক্ষেত্রে মেডিকাল বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দেশীয় স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাস্থ্য গবেষনায় উৎসাহ দিতে হবে, প্রয়োজনে কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে হবে, এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে গবেষণার জন্য অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে [স্বল্প-মেয়াদী]

২৫. নারী স্বাস্থ্য: [মধ্য-মেয়াদী]

নারীর সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিশ্চিত করতে 'জাতীয় নারীস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠান বিশেষায়িত সেবা প্রদান, সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি হাসপাতালের জন্য রেফারেল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে এবং তাকে স্বাস্থ্যকর্মীদের নারী স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এটি নারীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত উপেক্ষিত ও জটিল সমস্যার সমাধানে নেতৃত্ব দেবে এবং নারীস্বাস্থ্যকে জাতীয় অগ্রাধিকারের পর্যায়ে উন্নীত করবে। মা, শিশু, কৈশোরকালীন ও বিশেষ প্রয়োজনে থাকা ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী ও সম্মানভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। এইসব জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনভিত্তিক ও সংবেদনশীল সেবা-প্রদান ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত না হন এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত হয়। তদপুরি নারীস্বাস্থ্যে সরকারি ও ব্যক্তিগত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউট গুলোকে উৎসাহিত করতে হবে এবং সরকারি সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। একই সাথে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বৃদ্ধদের মানসিক সুস্থতা,রোগ, মানসিক ও শারীরিক গড়ন, বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা-চেতনা, সামাজিকতা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টিকে প্রাধান্য দিতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২৬. জলবায়ু ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে শিশু, কিশোর-কিশোরী,মহিলা ও গর্ভবতীদের জন্য সম্মানজনক পরিবেশের নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে দুর্যোগ-নিরোধক ও নারী, শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক বান্ধব হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২৭. বাংলাদেশের বাইরে কর্মরত সকল চিকিৎসক, নার্স, প্রযুক্তিবিদ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবীদের দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ ও উন্নয়নের জন্য তাদের মূল্যবান দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরে আসার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য একটি বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে, যা প্রত্যাবর্তনকারী পেশাজীবীদের প্রয়োজনীয় সুবিধা ও সহায়তা প্রদান করবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২৮. ক) সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও বেশ কিছু দীর্ঘস্থায়ী জটিল ব্যাধির অতি দ্রুত হার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির রেজিস্ট্রি তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা জরুরি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই রেজিস্ট্রি, সঠিক পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে, এসকল ব্যাধির চিকিৎসা ও প্রতিরোধ পরিকল্পনায় প্রচুর ভূমিকা রাখতে পারে।

খ) উপরোক্ত সুপারিশের ধারাবাহিকতায়, অগ্রাধিকারভিত্তিতে, অত্যন্ত ব্যয়বহুল মরণব্যাধি ক্যান্সারকে প্রথমে নির্বাচন করে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করার সুপারিশ করা হচ্ছে। এর আওতায়, জেলা ও উর্ধ্বতন সকল সরকারি হাসপাতাল এবং ১০০ শয্যার অধিক বেসরকারি হাসপাতালে প্রাথমিক ক্যান্সার শনাক্তকরণ কেন্দ্র স্থাপন এবং ক্যান্সার রেজিস্ট্রি চালু,নিয়মিত স্ক্রিনিং কর্মসূচি চালু, ক্যান্সার শনাক্তকরণ ও চিকিৎসার জন্য হিস্টোপ্যাথোলজিস্ট, ক্লিনিক্যাল অনকোলজিস্ট, গাইনি অনকোলজিস্ট, মেডিক্যাল অনকোলজিস্ট, নার্স, টেকনোলজিস্টসহ প্রয়োজনীয় জনবল গড়ে তুলতে হবে এবং ক্যান্সার ট্রাস্ট ফান্ড সৃষ্টি করতে হবে। এর মাধ্যমে ক্যান্সার দ্রুত শনাক্ত, চিকিৎসা এবং মৃত্যুহার কমানো সম্ভব হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

২৯. BHC-র নির্দিষ্ট উইং-এর তদারকির মাধ্যমে সারা দেশব্যাপী রোগ-ব্যাধির নজরদারি বা সার্ভেলেন্স কার্যক্রমকে আরো গুরুত্ব দিয়ে উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আই ডি সি আর-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

৩০. পুলিশ, শ্রমিক, জেলবন্দি, ড্রাইভার, ইত্যাদি পেশার মানুষকে জরুরী স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক দায়িত্ব পালনে সহায়তার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আন্তঃজেলা সড়কের পাশে প্রতিটি উপজেলায় ট্রমা সেন্টার ও রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র থাকতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

৩১. **নবজাতক, শিশু, কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য বিকাশ এবং মঙ্গল:** [মধ্য-মেয়াদী]

একটি নিরবিচ্ছন্ন ডিজিটাল তথ্য সম্প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলির সার্বজনীন নজরদারি এবং সময়োচিত ও যথাযথভাবে মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে রেফার করার মাধ্যমে নবজাতক, শিশু, কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য, বিকাশ এবং মঙ্গল সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। [মধ্য-মেয়াদী]

৩২. **পেশাগত নিরপেক্ষতা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা:** [মধ্য-মেয়াদী]

স্বাস্থ্যখাতের অস্থিতিশীলতা মোকাবেলায় পেশাগত নিরপেক্ষতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা (১৯৭৯) অনুযায়ী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। জনগণের ট্যাক্সের অর্থে (সরকারি অর্থে) পরিচালিত প্রতিষ্ঠান (যেমন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান)-এর স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা এবং সরাসরি দলীয় রাজনীতি সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের নির্বাহী পদে ‘না’ রাখার প্রস্তাব করা হচ্ছে।